হোচট

– ন. ই

টেলিফোনটা কাধে চেপে ধরে লিখতে লিখতেই উত্তর দিলাম, হ্যালো।

নারী কণ্ঠে উত্তর এলো, হ্যালো। কেমন আছেন?

বললাম, ভালো। আপনি কেমন?

উত্তর এলো, অনেক ভয়ে ভয়ে টেলিফোন করেছি।

হেসে ফেলে বললাম, কেন? আমাকে আবার ভয় কিসের? আমি তো মেষবৎ প্রাণী। আর ব্যাঘ্র হলেই বা কি, নখ–দন্তবিহীন বৃদ্ধ।

বললো, আপনার যে রূপটি আমার চোখে ভাসে তা ভয়ের মূর্তিমান প্রতীক। আমি এখনো ভীত হই সেই মূর্তির কথা মনে হলে। আমাকে চিনতে পেরেছেন কি? আবার প্রশ্ন করলো।

ধাধায় পড়ে গেলাম। পেশার কারণে অনেক নারী–পুরুষ আমার কাছে যাতায়াত করে, টেলিফোন করে। অনেকের সঙ্গে ঠাট্টা মশকরাও হয়। সবাইকে সব সময় চেনা সম্ভব হয় না। ভাবছি কে হতে পারে!

মিথ্যে করেই বললাম, পেরেছি। বলুন কি সমস্যা?

ভাবলাম আলাপ চলাকালে হয়তো চেনার কোনো সূত্র বের হয়ে যাবে।

উত্তর এলো, পারেননি। পারলে আপনি করে বলতেন না।

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। আমার সঙ্গে তুমি সম্পর্ক, অথচ চিনতে পারছি না। কে হতে পারে?

আবার বললো, তুমি করে না বললে কথা বলবো না। গলায় অভিমানের সুর।

সবার স্বর সব সময় শনাক্ত করতে পারি না টেলিফোনে। বয়সের কারণেও ইদানীং আরো হচ্ছে। হার স্বীকার করে বললাম, চিনতে পারিনি। এবার বলেই ফেলো কে বলছো?

বলছি। তবে তার আগে কথা দাও লাইনটা কেটে দেবে না। কণ্ঠে অনুনয়ে ভরা আবেদন।

কথা দিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে শোক কাপা গলায় শঙ্কামিশ্রিত কণ্ঠে বললো, আমি বীথি।

তবুও চিনতে পারিনি। ভাবছি, কে বীথি! ভাবছি। স্মৃতির গহীনে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল।

বীথিকে চিনতে পারলাম। এতো বছর পরে! কিন্তু কেন?

কম করে হলেও পয়তাল্লিশ বছর আগে হবে। আমার বয়স হয়েছে। ওরও হয়েছে। দেখা নেই, হয় না, হবার কারণও নেই। শুনেছি ওর বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে, নাতি–নাতনি হয়েছে। আমারও একই অবস্থা। এতো বছর পর যোগাযোগের চেষ্টা। কিন্তু কেন?

বীথিরা আমাদের পাড়ায় ভাড়াটে হিসেবে এলো। আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। বয়সের তুলনায় মাথা লম্বা। দেখতে মোটেও সুশ্রী নয়। তবে খুব চঞ্চল ও চপল স্বভাবের।

আমাদের বাসায় আসা–যাওয়া করতে করতে কিভাবে যেন চিঠি চালাচালি শুরু হয়ে গেল। আজো ভেবে পাই না আমি কেন লিখলাম। ওকে ভালো লাগেনি, ভালো তো বাসিইনি। তবে কেন?

মনে হয় একটা বয়সে নারী–পুরুষ উভয়েরই মনে অপর পক্ষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয়, কাম্য করে তোলার একটা প্রবণতা কাজ করে। হয়তো বা তার প্রভাবেই আমরা এটা করেছি। ওর চিঠিতে তেমন কোন গভীরতা আছে বলে আমার মনে হয়নি। কতোই বা বয়স! হয়তো তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারেনি।

ওকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, প্রেম–ট্রেমের মধ্যে আমি নেই। যদি আনন্দ পাও, আনন্দ পেতে চাও তবে এসো। স্পষ্ট ইঙ্গিত। মিথ্যা করেও কখনো ভালোবাসার কথা বলিনি। কোনো প্রতিশ্রুতিও দিইনি কখনো। এরপরেও ও এসেছে। শারীরিক সম্পর্ক বলে একটু ছোয়াছুয়ি, চুমু দেয়া–নেয়া। শুধু এ পর্যন্তই।

তবে আমার দিক থেকে ওর তুলনায় বেশি প্রেমহীন জৈবিক উত্তেজনা ছিল।

পাড়ারই একটি ছেলে ওদের বাসায় যাতায়াত করতো। ওকে এ নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করেছি। বলেছে, দাদার বন্ধু, দাদার কাছে আসে।

ছেলেটার বিষয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা জেলাসি অনুভব করিনি। বীথিকে ভালোবাসলে না তবে এ প্রসঙ্গ আসতো! তবু প্রায়ই এই ছেলেটাকে নিয়ে ওকে খোচা দিতাম।

এক সময় আমার মনে হতে লাগলো বীথি ওই ছেলেটাকে ভালোবাসে। যদিও আমাকে ভালোবাসার কথা বলে কিন্তু আসলে ভালোবাসে ওই ছেলেটাকে।

আমার রাগ হলো। কিন্তু রাগ হবার কোনো কারণই ছিল না। বাসুক না ভালো ওই ছেলেটাকে, আমার তাতে কি! নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আমি কি বীথিকে ভালোবাসি? না, বাসি না।

বীথি যদি বলতো, ওই ছেলেটাকে আমি ভালোবাসি। আমাদের সম্পর্ক যাই ছিল, এখানেই শেষ হয়ে যাক। তবে কি করতাম আমি?

মেনে নিতাম সহজ ভাবে। হয়তো বা হাপ ছেড়ে বাচতাম। অথচ সে তা করছে না কেন? আমার মনে হতে লাগলো বীথি আমাকে নিয়ে খেলছে এবং এটা ভেবেই আমার রাগ বেড়ে চললো। ভীষণ ক্রোধের জন্ম হলো আমার মধ্যে। সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে শায়েস্তা করবো। ভীষণভাবে অপমান করবো।

দেখা করতে বললাম।

দেখা করতে এলো ও।

চাকু হাতে মদ্যপের ভয়ঙ্কর চরিত্রের অভিনয়ে নিজেকে প্রকাশ করলাম।

ও ভীত হলো।

ওকে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করলাম। প্রেমহীন একটি সঙ্গম দিয়ে অপমান করতে উদ্যত হলাম।

কিন্তু দোরগোড়াতেই হুমড়ি খেলাম। ওর মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম না। হয়তো তরুণ বয়সের মানসিক অস্থিরতার কারণে।

ওর সঙ্গে সম্পর্কের সেখানেই হলো ইতি।

এরপর থেকে শুরু হলো আমার মানসিক যাতনা। ভাবতে লাগলাম কেন এ কাজ করলাম! আমি তো এ রকম চরিত্রের বা মানসিকতার লোক নই। তবে কেন করলাম?

নিজের কাছেই ভীষণ অপরাধী হয়ে গেলাম। অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত হলাম। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। শুধু ভাবি কেন করলাম! কেন করলাম! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে চললাম।

অবশেষে আমার মনে হলো, নারী–পুরুষ উভয়েই অপর পক্ষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে, উপস্থাপন করতে চায়, চায় প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের অবস্থানে থাকতে। কারো কাছে নিজেকে অনুরূপ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখার পর সেখান থেকে স্থানচ্যুতি সে মেনে নিতে পারে না, মানতে চায় না। সে হয় ক্ষিপ্ত। আমার অবচেতন মনে এমন একটা কিছু কাজ হয়তো করে থাকবে।

বহু বছর ওই ঘটনা আমার মানসিক পীড়ার কারণ হয়েছিল।

দিনকয়েক পর আবার ও টেলিফোন করলো। কথায় অনেক অনুযোগ, অনেক অভিমান।

বললাম, এতো বছর পর, আমাদের এই বয়সে কেন এ অর্থহীন প্রলাপ? এখন আমাদের দুজনেরই নাতি–নাতনি হয়েছে। বয়স হয়েছে। এখন এসব কথার কোনো অর্থ হয় না। যা ঘটেছে আমি তার জন্য দুঃখিত। তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

কেদে ফেলে সে বললো, কোনো প্রয়োজন নেই বুঝি?

তবুও আমার ক্ষোভ, আমার বেদনা, অপমান বোধ আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আমাকে তোমার ভুল বোঝা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি শান্তি পাই না।

একদিন সে দেখা করতে চাইলো।

না বলতে পারলাম না।

আমার জন্য ফুল নিয়ে এলো। খাবার নিয়ে এলো। কবে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিল সেই দিনটার কথা বললো। কথায় কথায় অনুযোগ আর অভিমান।

তুমি আমাকে বুঝতে পারোনি, বুঝতে চেষ্টা করোনি। আমার ভালোবাসা তোমাকে বোঝাতে পারিনি। আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি।

আরো কয়েক দিন চলে গেল।

মাঝে মধ্যে সে টেলিফোন করে।

একদিন সে বাসায় আমন্ত্রণ জানালো।

গেলাম।

ওর রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করলো কথায় এবং স্পর্শে, একটি যুবতী মেয়ের মতো। চুমুতে চুমুতে আপ্লুত করে তুললো। আলিঙ্গনে উদ্দীপ্ত করে তুললো।

বললো, তুমি আমার কামনার পুরুষ। আমি তোমাকে শয্যায় পেতে চাই। তোমাকে বহন করতে চাই।

ওকে আহত করতে চাইলাম না। ভাবলাম এতে যদি ওর মনের ক্ষোভ স্তিমিত হয় তবে তা-ই হোক। তাছাড়া আমিও তো তাকে একদিন তারুণ্যের দোরগোড়ায় চেয়েছিলাম।

কিন্তু না। হলো না।

এবারও দোরগোড়ায় হোচট খেলাম।

অক্ষমতার কারণে, বয়সের ভারে।

পূর্ণ নাম ঠিকানা বিহীন, ঢাকা থেকে

হৃদয়ের দশটি কথা

- তা. রে.

এক. প্রেমের জোরে পৃথিবী ঘোরে।

– অজ্ঞাত

দুই. মানুষকে মূল্যায়ন করতে গেলে ভালোবাসার জন্য কোনো সময় থাকে না।

– সমাজকর্মী মাদার টেরেসা

তিন. পুরুষরা সব সময় মেয়েদের প্রথম প্রেমিক হতে চায় আর মেয়েরা পুরুষকে পেতে চায় তার শেষ রোমান্স হিসেবে।

– লেখক অস্কার ওয়াইল্ড

চার. শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ বিবাহিত জীবন যাপন করার আগে প্রকৃত প্রেম কি সে সম্পর্কে নারী বা পুরুষের কোনো ধারণাই হয় না।

– লেখক মার্ক টোয়েন

পাচ. তোমার প্রতি কারোর গভীর ভালোবাসা তোমাকে শক্তিশালী করে আর তুমি কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসলে তোমার সাহস বাড়ে।

- চায়নিজ দার্শনিক লাও জু

ছয়. তুমি বলো, কে তোমাকে ভালোবাসে অথবা কে তোমার প্রতি আসক্ত। এ থেকেই আমি বলতে পারবো তুমি কে।

- সমাজ সংস্কারক চার্লস অগাস্টিন সান্তা

সাত. মাঝে মধ্যে আমার মনে সন্দেহ হয়, নারী এবং পুরুষ কি সত্যিই এক অন্যের সঙ্গে খাপখাইয়ে চলতে পারে? বরং পাশাপাশি বাড়িতে বসবাস করে মাঝে মধ্যে যাওয়া–আসা করাই বোধহয় ভালো।

– অভিনেত্রী ক্যাথরিন হেপবার্ন

আট. ভালোবাসার জন্যই আমাদের জন্ম। এ নীতিই আমাদের জিইয়ে রেখেছে। আর বেচে থাকাই আমাদের উদ্দেশ্য।

- পলিটিশিয়ান বেনজামিন ডিজরেলি

নয়. প্রেমের সঙ্গে প্রতিদানের কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি কতোটা দিতে পারছো সেটাই মূল কথা।

- অজ্ঞাত

দশ. যুদ্ধ করো না, সংগম করো।

- অজ্ঞাত

ঢাকা থেকে

গোপন দেখা

– কাজী মাহমুদুর রহমান

ভালোবাসা এবং কল্পনা যমজের মতোই আপন
যা ঘটেনি তাতেই যাপন। (পুর্নেন্দু পত্রী)

রোজ সকালে ধানমন্ডি লেকের পাড়ে হাটতে যাই। ঘণ্টা খানেক হেটে আসার পর বাসায় যখন ফিরি তখনো বাসার সবাই ঘুমিয়ে। আমি একা বসে কাগজ পড়ি। আজ সকালেও বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। পাশেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা কানে নিয়ে বললাম, হ্যালো?

অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

আবার বললাম, হ্যালো ... হ্যালো?

এবার নারীকণ্ঠে কেউ যেন কাপা কাপা কণ্ঠে বললো, গোরা?

আমার সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠলো *গোরা* নাম শুনে। এই নামটি তো শুধু একজনই জানে যে আমাকেই শুধু এ নামে ডাকতো। আমি বিস্মিত, বিমূঢ়তা ভেঙে বললাম, তুমি!

অপর প্রান্ত থেকে সে বললো, হ্যা, আমি গোলাপ।

বললাম, চল্লিশ বছর পর!

চল্লিশ বছর পর যে তোমাকে দেখলাম।

কোথায়?

ধানমন্ডি লেকের পাড়ে তুমি হাটছিলে।

তুমিও কি হাটতে গিয়েছিলে?

না।

তাহলে?

আমি গাড়িতে ছিলাম। তুমি লেকের বৃজের ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলে।

তাই বুঝি মনে পড়লো?

গোলাপ আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিল না। বললো, আগে প্রায়ই তোমাকে টিভিতে দেখতাম। এখন অনেক দিন দেখি না কেন?

আগের মতো আগ্রহ নেই, ইচ্ছেও হয় না।

কেন?

সব কেনরই কি উত্তর হয়। যাক ওসব কথা। তুমি আমার টেলিফোন নাম্বার পেলে কি করে?

আমার এক আত্মীয় তোমাদের অফিসে চাকরি করতেন তার কাছ থেকে।

কি নাম তার?

সারোয়ার সাহেব, এ.ও।

চুপ করে রইলাম।

গোলাপ আবার বললো, মাঝে মধ্যে ওনার কাছে তোমার খবর পেতাম।

নিশ্চয় শুনেছো আমি একটা বাজে, বদরাগী লোক।

গোলাপের মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এলো। বললো, হ্যা শুনেছি। শুনেছি তুমি মানুষটা নাটকের পোকা। বাইরে হাসি-খুশি, উদার। অথচ অফিসের কাজের বেলায় ভীষণ কড়া।

আর চরিত্র?

ফুলের মতো পবিত্র।

এবার আমার হাসার পালা। আমার হাসি বোধহয় ওর মধ্যেও সংক্রমিত হলো।

বললো, রিটায়ারমেন্টের পর সময় কাটাও কি করে?

রিটায়ার বুড়োরা যা করে।

কি করে?

হাটাহাটি, হাটবাজার, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া, খবরের কাগজের হেডলাইন থেকে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন বার বার পড়া ...।

গোলাপের হাসির শব্দ ভেসে এলো। হাসতে হাসতে বললো, তোমার তো তাহলে মেলা কাজ।

বললাম, হ্যা, তা বটে। আমার ফিরিস্তি তো শুনলে। এবার তোমার কথা বলো। তুমি কেমন আছো গোলাপ?

প্রশ্নের উত্তরে নীরবতা।

হ্যালো, হ্যালো করে ওর আর কোনো সাড়া পেলাম না। বোধহয় লাইনটা কেটে দিয়েছে।

রিসিভার রেখে কিছু সময় চুপ করে বসে রইলাম। আমার স্ত্রী ও মেয়েরা অন্য ঘরে এখনো ঘুমুচ্ছে। ভাবনা চিন্তায় আমার মাথার মধ্যে সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল। শরীর ঘামতে শুরু করলো, বুকের মধ্যে

কেমন যেন কষ্ট হতে লাগলো। গোলাপ কেন ফোন করলো? স্মৃতি মানেই ক্ষত। চল্লিশ বছরের শুকনো ক্ষতটা গোলাপ কেন আজ আবার নতুন করে উসকে দিল।

একটা মফস্বল শহরে ছিল আমাদের বাড়ি। দোতালা বাড়ির উপর তলায় আমরা থাকতাম, নিচের অংশ ভাড়া দেয়া হতো। সেই বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে এলেন হাবিবুল আলম নামে এক ভদ্রলোক। আট ছেলেমেয়ে নিয়ে বিশাল তার পরিবার। গোলাপ তার পঞ্চম কন্যা, বয়স বছর বারো। তার বর্ণ গোলাপের পাপড়ির মতোই, গোলাপ কুড়ির মতোই স্ফুটোন্মুখ।

আমি তখন ডানপিটে কিশোর, বছর পনেরো বয়স, ক্লাস টেনের ছাত্র। মেয়েদের সম্পর্কে তখন জানাশোনা নেই, অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু যৌবনের উন্মেষে আছে অনন্ত কৌতূহল। সেই বয়সে গোলাপকে দেখেই আমার অবাক কিশোর মন আনন্দে গেয়ে উঠলো, *বল, গোলাপ মোরে বল তুই ফুটিবি সখী কবে*।

আমার গানে কিশোরী গোলাপ প্রথমে ভ্রূকুটিত রাগ, তারপর হেসে ফেললো। বললো, *আমি গোলাপ, তুমি শিয়ালকাটা*। বলে জিভ ভেংচি দিয়ে পালিয়ে গেল।

মুগ্ধ কণ্ঠে নিজেই নিজেকে বললাম, *ওই স্ফুটোন্মুখ গোলাপ শুধু আমারই, আমারই*। সেই গোলাপ ফোটানোর স্বপ্নে শুরু হলো আমার নিরন্তর সাধনা।

কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা, কথা বলা বা সহজভাবে মেলামেশার কোনো উপায় ছিল না। আমরা একই বাড়িতে, অথচ দুই পরিবারের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। সবচেয়ে বড় বাধা ছিল উভয় পরিবারের রক্ষণশীল মনোভাব। আমাদের ভাইবোন বা ওদের ভাইবোনদের চারদিকে সতর্ক শাসনের দেয়াল। এ দেয়ালের মাঝেই নীরবে, নিঃশব্দে আমার আর গোলাপের হাটিহাটি পা পা ভালোবাসার খেলা শুরু হলো, শুরু হলো চোখে চোখে চাওয়া, চোখের ভাষায় মনের কথা বলা, মাঝে মধ্যে গোপন চিঠির চিরকুট। চিঠিতে ও আমাকে সম্বোধন করতো গোরা বলে। গোলাপের *গো* আর রাহমানের *রা* এই নিয়ে গোরা।

চিঠিতে ও আমাকে গল্প লিখতে, কবিতা লিখতে, ছবি আকতে উৎসাহ যোগাতো।

আমি ওর জন্যে ছোট ছোট ভালোবাসার কবিতা লিখে, ছবি একে ওকে উপহার দিতাম।

ও ভীষণ খুশি হতো। নিজেও চমৎকার ছবি আকতো।

এমনি করে বয়সের পাপড়ি মেলতে মেলতে গোলাপ যখন পনেরোয়, আমি তখন আঠারোর যুবক, কলেজের ছাত্র। আমাদের চোখের ভাষা তখন আরো গভীর। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি। অথচ কেউ কাউকে স্পর্শ করার, হাতে হাত রাখার সুযোগ পাই না। সব ভালোবাসা, আবেগ, আনন্দ, যন্ত্রণার ছোট কথা শুধু গোপন চিঠির পাতায় উজাড় করে দিই। কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা মেটে? ভালোবাসা মানেই তো দুজনের এক হবার প্রবল বাসনা। সেই বাসনায় আমরা দুজনেই সারাক্ষণ ধূপকাঠির মতো জ্বলি আর পুড়ি।

একদিন ওর সম্মতিতেই সন্ধ্যার কিছু পরে আমাদের উঠোনের শেষ প্রান্তে কূয়োর আড়ালে বসে রইলাম। কূয়ো থেকে একটু দূরেই প্রাচীরের কোণে ওদের বাথরুম আর আলাদা টয়লেট। এদিকটা বেশ ঘন অন্ধকার। তখন বাড়িতে বিজলি বাতির চল ছিল না। রাতের সব কাজকর্ম, পড়াশোনা সব কিছু চলতো হ্যারিকেনের আলোয়। সে আলো উঠোনে পৌছাতো না বলে সেটাই ছিল আমার একমাত্র সুযোগ এবং সহায়।

গোলাপ আর তার ভাইবোনেরা ওদের ঘরের মধ্যে পড়াশোনা করছিল। বাথরুমে যাবার নাম করে গোলাপ একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ঘর থেকে উঠোনে নেমে এলো। কূয়োর সামনে দিয়েই প্রবেশ করলো ওদের বাথরুমে। তারপর ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল।

আমিও শিকারি বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ওদের বাথরুমে প্রবেশ করলাম। সেই আমাদের প্রথম পরস্পরকে কাছে পাওয়া, প্রথম স্পর্শ, প্রথম চুম্বন। সুবাসিত, অনাঘ্রাত কিশোরী গোলাপ আমার বুকের ভেতর উত্তেজনায় কাপছিল। জীবনের প্রথম চুম্বনের স্বাদে, অনাস্বাদিত আনন্দে আমার বুকের ভেতর উষ্ণরক্ত বার বার ছলকে পড়ছিল। মুখোমুখি দুটো দেহ যেন শেকড়ের মতো নক্ষত্র ভরা রাতকে জড়িয়েছিল।

জানি না কতোক্ষণ ছিলাম সেই অবস্থায়। সম্ভবত দুই তিন মিনিট। মনে হচ্ছিল এই মুহূর্ত, এ রাত যদি কোনোদিন শেষ না হতো। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে অতি দ্রুত আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হলো। প্রথম গোপন দেখার অব্যক্ত আনন্দময় শিহরণ নিয়ে আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম আগের মতোই নিঃশব্দে।

গোলাপ আমাকে পরে চিঠিতে লিখেছিল, জানো, তোমার সঙ্গে দেখা করার আগে ভয়, ভাবনায় আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। তোমার বুকে যখন মাথা রাখলাম, মনে হলো বরফ গলা জলে মাথা রাখলাম। এক মুহূর্তে আমার সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। এই, তোমার বুকটা এতো ঠাণ্ডা কেন? তুমি কি উত্তর মেরু?

উত্তরে লিখেছিলাম, হ্যা, উত্তর মেরুতে ছিলাম। এখন গোলাপের আগুনে পুড়ছি আর গলছি। আমাকে আরো পোড়াও, গলাও। হাজার বছরের জমাট হিমবাহে ধস নামিয়ে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটিয়ে দাও।

প্রলয় ঘটাতে আমরা আরো সাহসী হলাম। সময়–সুযোগ বুঝে আরো বেশ কয়েকবার আমাদের গোপন দেখা হলো ওই বাথরুমের মধ্যে। কিন্তু সব কিছুই সীমাবদ্ধ থাকতো চুম্বন আর গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে। সেই বয়সের ভালোবাসা ছিল আমাদের পবিত্র বিশ্বাস। ভালোবেসে জৈবিক তাড়নায় আমরা অন্যায় কিছু করবো না এই ছিল আমাদের প্রতিজ্ঞা।

পৃথিবীতে যে দুটো জিনিস চাপা থাকে না তা হচ্ছে পাপ এবং প্রণয়। অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও আমাদের প্রণয়ের কথা চাপা রইলো না।

দুপক্ষের অভিভাবকেরা রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন গোলাপের বাবা মা আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন অন্যত্র।

গোলাপকে হারিয়ে আমার তখন উন্মাদ দশা। ওর সঙ্গে দেখা, কথা, চিঠি সবই বন্ধ। ও স্কুলে যায়–আসে কড়া পাহারায়। আমার ঘুম নেই, আহার নেই, পড়াশোনা নেই। আমি সবার করুণার পাত্র, উপহাসের পাত্র। বাড়ির সবাই আমার প্রতি তিক্ত–বিরক্ত। কিন্তু আমি কি করবো কিছুই ভেবে পাই না।

এমনি করে বেশ কিছু সময় পার হলো। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম ওর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করতে।

বহু চেষ্টা করে গোলাপের দুজন স্কুল বান্ধবীর শরণাপন্ন হলাম।

আমার অবস্থা দেখে ওদের বোধহয় দয়া হলো। ওদের মাধ্যমে আবার গোলাপের সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ শুরু হলো।

কিন্তু দেখা হবার উপায় কি? গোলাপের তো কোনো উপায় নেই আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করার।

মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষেরই সনে গানটা গুনগুন করে গাই আর আকাশ–পাতাল ভাবি।

তখন রমজান মাস চলছে, সামনে ঈদ। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মাথায় এলো। দেখা হবার পরিকল্পনাটা আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বললাম, গোলাপের বান্ধবীদ্বয়কে বললাম।

ওরা সম্মত হলো আমাকে সাহায্য করতে।

বন্ধুর এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন নিঃসন্তান দম্পতি। তারা থাকতেন শহরের অন্য একটি এলাকায় যেখানে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অচেনা। আমি আর আমার বন্ধু সেই বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত শুরু করলাম নানান রকম উপহার নিয়ে। এভাবে তাদের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা এবং সখ্যতা গড়ে উঠলো।

এক সময় তারাও সম্মত হলেন আমার গোলাপের গোপন দেখার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে।

আমার প্রতীক্ষিত ঈদ এলো। ঈদের দিন দুপুর থেকেই আমি ও আমার বন্ধু সেই বাড়ির বেশ কিছু দূরে একটা নির্দিষ্ট মোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অন্যদিকে গোলাপের দুই বান্ধবী গোলাপকে তাদের বাসায় বেড়াতে নিয়ে যাবার নাম করে বের করে নিয়ে এলো।

কড়া বিধি–নিষেধের মধ্যে শুধু ঈদের দিন বলে গোলাপ কিছুটা স্বাধীনতা পেল বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর।

বান্ধবীদ্বয়সহ গোলাপের রিকশা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের অপেক্ষার স্থানে আসতেই আমি এবং আমার বন্ধু অন্য রিকশা নিলাম।

ওদের রিকশা আমাদের রিকশাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

আমাদের গন্তব্যস্থল বন্ধুর সেই আত্মীয় বাড়ি। সেখানে সবাই ঈদের দাওয়াত খেতে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের চিনে ফেলার কেউ নেই। ঈদের দিন বলে সন্দেহ করারও আবকাশ নেই।

অসম্ভব সতর্কতায় সবার চোখ এড়িয়ে বন্ধুর আত্মীয় বাড়ি পৌছে কিছুটা স্বস্তি আর শান্তি।

সবাই মিলে গল্প–গুজব, খাওয়া–দাওয়া, তারপর এক ফাকে আমার ও গোলাপের বহু প্রতীক্ষিত একান্ত মিলনমেলা। ভয় আর উত্তেজনায় ও বেশ অস্থির আর উত্তপ্ত।

ও যখন আমার বুকে মাথা রাখলো, মনে হলো খর দুপুরের দাবানলে ও পুড়ছে।

ওকে অভয় দিলাম, আকাঙ্ক্ষার আলোকে প্রজ্জ্বলিত করলাম, অসহ্য আনন্দে পরস্পর জড়িয়ে থাকলাম, সমস্ত না বলা কথা বললাম ঠোটে ঠোট রেখে। হাজার লক্ষ চুম্বনে রঙচটা, বিবর্ণ সেই ছোট্ট গোপন ঘরটি ভরে উঠলো ভালোবাসার গোলাপ গন্ধে।

বিকেল গড়িয়ে সময়ের আয়ু শেষ হলো। আমাদের স্বপ্নের আয়ুও শেষ হলো। স্বপ্নের ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। এবার বিদায়ের পালা।

গোলাপের চোখে ভয়, উৎকণ্ঠা। বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, যাই।

বললাম, এসো। আবার দেখা হবে।

গোলাম বললো, না, হয়তো আর দেখা হবে না।

বললাম, হবে। আরো একটিবার দেখার জন্য আমি হাজার বছর অপেক্ষা করবো।

ম্লান হেসে ও চলে গেল ওর বান্ধবীদের সাথে।

আরো একটিবার দেখা আমাদের আর হলো না। গোপনে দেখা করার ঘটনাটি কি জানি কেমন করে প্রকাশ হয়ে গেল এর প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক।

সম্পূর্ণ গৃহবন্দী অবস্থায় মানসিক চাপে ও ভেঙে পড়লো। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল হলো খুব খারাপ।

ওর বাবা ওকে পাঠিয়ে দিলেন নির্বাসনে দূরে কোথাও তাদের কোনো আত্মীয় বাড়িতে।

কোথাও ওর খোজ পেলাম না। উপায়ান্তর না দেখে নিজের ক্ষত উপশমে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম আড্ডা, রাজনীতি আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। এর মধ্যে বিএ পাস করে ঢাকায় এসে ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে।

হঠাৎ একদিন ওর একটা চিঠি পেলাম। ঠিকানা বিহীন চিঠি। চিঠির মধ্যে ওর সূচিকর্মের ছোট্ট একটা রুমাল, ভাজে ভাজে গোলাপ পাপড়ি। রুমালের ওপর লেখা, *গোরা, ভালোবেসে নাকি ভালোবাসার মানুষকে রুমাল দিতে নেই। রুমাল হারিয়ে গেলে ভালোবাসাও নাকি হারিয়ে যায়। রুমালটি হারিও না। হারালে আমিও হারিয়ে যাবো*।

গোলাপের সেই রুমালটি হারাবো না হারাবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেও কেমন করে জানি না হারিয়ে ফেললাম।

একদিন আমার বন্ধু এসে জানালো গোলাপের বিয়ে হয়ে গেছে।

শুনে কয়েক মুহূর্ত বন্ধুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। প্রবল ভূমিধসে ভেঙে পড়ার আগেই কান্নার বদলে হেসে উঠলাম।

এরপর শুরু হলো আমার অন্য জীবন।

গোলাপকে ভালোবেসে হতে চেয়েছিলাম অসাধারণ প্রেমিক। জীবনের গদ্যকে পদ্য বানাতে চেয়েছিলাম। গোলাপকে হারিয়ে এবার হতে চাইলাম নিরস গদ্যের সাধারণ মানুষ।

লেখাপড়া, চাকরি, বিয়ে, সন্তান উৎপাদন, সংসারধর্ম সব কিছুতে কিছু সাফল্য, কিছু ব্যর্থতা, কিছু তৃপ্তি, কিছু অতৃপ্তি, ভালো অথবা কিছু মন্দে মেশানো আমার ষাট বছরের জীবন এখন একজন পরিপূর্ণ সাধারণ মানুষের সুখী গৃহীর শেকল পরানো জীবন। গোলাপকে নিয়ে চল্লিশ বছর আগের সুখ স্মৃতির পাপড়ি এখন কালগ্রাসে বিবর্ণ, শুষ্কা, ঘ্রাণহীন।

অস্বস্তিতে আমার কয়েকটা দিন কেটে গেল।

একদিন বিকেলে আবার হঠাৎ করে গোলাপের টেলিফোন।

কেমন আছো?

একই প্রশ্নের উত্তর আমি সেদিন পাইনি।

অসুবিধা ছিল।

আজ অসুবিধা নেই।

না।

থাকো কোথায়?

ধানমন্ডিতেই ছেলের বাসায়।

তোমার স্বামী?

গোলাপ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর ব্যথাতুর শ্বাস ছেড়ে বললো, নেই।

সরি, কতোদিন হলো?

তা প্রায় এক বছর।

তুমি তাহলে নিঃসঙ্গ?

নিঃসঙ্গ? না, নিঃসঙ্গ কোথায়? দুই ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি, নাতনি চারদিক আমার ভরভরন্ত।

গোলাপ বাগানে তাহলে অনেক গোলাপ?

হ্যা, অনেক গোলাপ। কিন্তু এই বুড়ি গোলাপের সব পাপড়ি ঝরে গেছে। শুকনো বোটায় জীবনটা ধুকপুক করছে।

চুপ করে রইলাম। অন্য ঘরে আমার স্ত্রী, মেয়েরা কথা বলছে। ওরা জানে না কার সঙ্গে কথা বলছি। যদি জানে আমি চল্লিশ বছর আগের প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলছি তাহলে এ বয়সে লংকাকাণ্ড না হোক, লজ্জাকাণ্ড হবে।

অপর প্রান্ত থেকে গোলাপ আবার আমাকে ডাকলো, গোরা?

বলো?

তুমি গোলাপ নাম দিয়ে নাটক লিখতে কেন?

যেমন?

গোলাপ আমার হৃদয়, তবুও গোলাপের গন্ধ।

আমি তো বকুলের নাম দিয়েও নাটক লিখেছি, *বকুলপুর কতোদূর।* আমার নাটকের নায়িকাদের কারো নাম শানু, কারো নাম রানু, কেউ নদী, কেউ বীথি, কেউ রিতু।

লক্ষ হাজার মেয়ের কথা থাক। তুমি শুধু আমার নাম দিয়ে আর কখনো নাটক লিখো না।

তোমার জীবনের সঙ্গে আমার নাটকের গল্পের কি কোন মিল ছিল?

না।

তাহলে?

যখন তোমার লেখায় গোলাপ নামের ডাক শুনি তখন আমার খুব কষ্ট হয়।

ঠিক আছে লিখবো না। গোলাপ নামের যে মেয়েটির জীবনের চল্লিশটি বছর আমার অচেনা তাকে নিয়ে নাটক লেখার সাধ্য আমার নেই।

আমার কথায় গোলাপ চুপ করে রইলো।

ওর সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলাম ওকে। গোলাপ?

বলো।

তুমি কেন টেলিফোন করেছো?

একটা অনুরোধ করতে।

কিসের অনুরোধ?

আমি একবার তোমাকে দেখতে চাই সামনাসমনি।

চমকে উঠলাম। বললাম, অসম্ভব।

ও বললো, কেন?

বললাম, এই বয়সে আমি উত্তর মেরু, তুমি দক্ষিণ মেরু। চল্লিশ বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া কিভাবে সম্ভব?

একটু চুপ করে থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কণ্ঠে ও যেন বলে উঠলো, তুমি যে কথা দিয়েছিলে।

কি কথা?

বলেছিলে, *আরো একটিবার দেখার জন্য আমি হাজার বছর অপেক্ষা করবো।*

সেই সব পুরনো কথার এখন নতুন কি উত্তর দেবো? চুপ করে রইলাম। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগের এক উন্মাদ প্রেমিক ঝোকের মাথায় কি বলেছিল তার এখন কি মূল্য আছে।

আমার নীরবতার মাঝে গোলাপ শান্তস্বরে বললো, কাল বিকেলে ধানমন্ডির লেকপাড়ে আমাদের দেখা হবে। তুমি এসো। বলেই গোলাপ লাইনটা কেটে দিল। আমাকে আর কিছু বলার অবকাশ দিল না।

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় আমার আবার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হলো।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার

তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার।

কুড়ি কুড়ি চল্লিশ বছর পর গোলাপের সঙ্গে দেখা করবো কি করবো না এই নিয়ে পরদিন সারা দিন আমার কাটলো অস্থির উত্তেজনায়। জানি এ দেখাতে দৈহিক আকর্ষণ নেই, ভালোবাসা নেই, পাপ নেই। তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। চল্লিশ বছর আগের মৃত ভালোবাসার শবদেহকে সামনে রেখে দুজনে কি কথা বলবো?

আমি এখন ষাটোর্ধ বৃদ্ধ, মাথায় টাক, পাকা গোফ, মুখে বয়সের বলিরেখা।

আর গোলাপ? সেও তো এখন আঠারো বছরের তরুণী নয়। ওরও তো মাথার চুল শাদা, মুখের চামড়ায় সময়ের দাগ। বয়সের ভারে হয়তো এখন ওর বুক কাপে, হাত কাপে, চোখে কাপে আলোর বদলে অন্ধকার। এই অবস্থায় ঘোলাটে চোখে আমরা কি দেখবো? আমাদের দুঃখী দুঃখী বুড়োটে মুখ। লেকের নিস্তরঙ্গ ঘোলা পানি। ধূসর আকাশ? ভাবতে ভাবতে আমার দিন পার হয়ে গেল, বিকেল গড়িয়ে গেল। গোলাপের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম না। ভাবলাম চল্লিশ বছর আগের গোলাপের যে ছবিটা আমার বুকের মধ্যে রাখা আছে সেটা সেখানেই থাক। দ্বিতীয়বার স্বপ্ন ভঙ্গ না-ইবা হলো।

পরদিন ভোরে নিয়ম মতো হাটতে গেলাম ধানমন্ডির লেকে। আবাসিক এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের সামনে দেখি বেশ কিছু মানুষের ভিড়। সবার মুখই কিছুটা যেন বিষণ্ন। তাদের মধ্যে আমাদের অফিসের সাবেক এ.ও. সারোয়ার সাহেবও দাড়িয়ে।

আমি থমকে দাড়ালাম।

সারোয়ার সাহেব আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন, হাত তুলে সালাম দিলেন।

অবাক কণ্ঠে বললাম, সারোয়ার সাহেব এতো সকালে আপনি যে এখানে? হাটতে এসেছেন নাকি?
সারোয়ার সাহেব বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, না স্যার, আমার এক আত্মীয়া গোলাপআপা শেষ রাতে মারা গেছেন। খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।
আমি বজ্রাহতের মতো দাড়িয়ে রইলাম।
সারোয়ার সাহেব আবার বললেন, উনি অনেক দিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিলেন। কাল দুপুরে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। সে জ্ঞান আর ফেরেনি।
সারোয়ার সাহেবের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার বললেন, হাসপাতাল থেকে ডেডবডি নিয়ে ওনার ছেলেরা এক্ষুণি ফিরবে। আপনি কি একটু অপেক্ষা করবেন স্যার? উনি কিন্তু আপনাকে চিনতেন। প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞেস করতেন।
কোনো কথা বললাম না। তেমনি নির্বাক দৃষ্টিতে দাড়িয়ে রইলাম।
বাড়ির সামনের জটলার মধ্যে থেকে কেউ সারোয়ার সাহেবকে ডাকলো।
সারোয়ার সাহেব সেদিকে এগিয়ে গেলেন।
আমি কাল বিকেলে গোলাপের সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। আজও গোলাপের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষা না করেই নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

ঢাকা থেকে

ভ্যালেনটাইনস ডে- তে হরতাল

– এম ফারুক চৌধুরী

সম্পর্কে সে আমার মামাতো বোন। তার চুল যেন নায়াগ্রা–র জলপ্রপাত, তুলতুলে গাল, রক্ত জবার মতো ঠোট আর তার সমগ্র শরীরের ওপর দিয়ে যেন বয়ে গেছে পল্লি গায়ের আকা এক অপূর্ব নদী যা শিল্পীকে আকর্ষণ করে তুলি ধরতে এবং কবিকে জোগায় কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা।
আমার কাছে সে তো এক স্বর্গের অপ্সরী। প্রথম দেখাতেই আমার হার্টবিট কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমার দিকে চেয়ে মুক্তা ঝরানো মিষ্টি হেসে যখন বাতাসে তার গন্ধ ছড়িয়ে গেল, এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার পলক পড়ছে না যেন সে স্রোতস্বিনী মেঘনা। যতোই তাকে দেখি ততোই মুগ্ধ হই।
একদিন তাদের সামনের ড্রয়িংরুমে বসে বসে লিও টলস্টয়ের বই পড়ছিলাম। এমনি সময় মামাতো ভাই খালেদ আমার হাতে এক টুকরো কাগজ গুজে দিয়ে বললো, আপু দিয়েছে।
খুলে দেখি তাতে লেখা আছে, *ভালোবাসি*।
সমস্ত শরীরে এক রোমাঞ্চকর শিহরণ অনুভব করলাম। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। সে মেঘ না চাইতেই আমাকে বৃষ্টি দান করলো।
চট জলদি টুকরো কাগজ টিকে নিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে দেখি ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোট্ট চেয়ারটিতে সে উপবিষ্ট এবং এক পাশে তার জলপ্রপাতের মতো চুলগুলো পড়ে আছে। পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা যেন তার মুখে ফুটে উঠেছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই।
তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কাকে ভালোবাসো?
উত্তরে বললো, জানো না?
তার হাতখানা আমার হাতের মুঠোয় নিলাম আর পাশে রাখা লাল লিপস্টিককে কলম বানিয়ে তার সুন্দর হাতের তালুতে লিখলাম *ভালোবাসি।*
আমার হাতের থেকে হাতটিকে মুক্ত করে তড়িত গতিতে চলে গেল।

তারপর থেকেই আমরা একজন অপরজনের ভালোবাসার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এক একদিন করে দুই মাস ছুটি কাটালাম। সময়টা যে কিভাবে চলে গেল তা বলতে পারবো না তবে এ দুই মাস যে আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময় ছিল তা হলফ করে বলতে পারবো।

সুনির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪–এ পেট্রডলার–এর জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতে আবার চলে এলাম। তবে বিদায়বেলায় শুধু এটুকু বলেছিলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি অচিরেই তোমাকে আমার করে নেবো।

কাছে এসে আমার দুই পায়ে সালাম করলো আমি মানা করা সত্ত্বেও। বললো, আজ আমাকে যা খুশি তা করতে দাও। দুই হাতে তাকে উপরে তুলে দেখি দুই চোখের পাতায় অঝোর ধারায় চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে।

বললাম, সে কি! তোমার চোখে পানি? পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় কি পানি কমে গেছে নাকি?

বললো, তোমর ফ্লাইট তো ১৫ ফেব্রুয়ারি, আর একটি দিন অপেক্ষা করো, আমাকে আমাদের জীবনের প্রথম ভ্যালেনটাইনস ডে উদযাপন থেকে বঞ্চিত করো না।

বললাম, দেখো, আমার কি ইচ্ছে হয় না? কিন্তু আমি যে অসহায়! আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের কাছে যে, এই দিন মূল্যহীন। যদি তারা ১৪ ফেব্রুয়ারির মূল্য বুঝতে পারতো তাহলে কি তারা এই দিনে হরতাল ডাকতো? তাই ১৩ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা গিয়ে কাগজপত্র তৈরি করতে হবে। আমাকে যেতেই হবে।

বললো, দেখা বেশি দিন দীর্ঘায়িত করো না, ভালো থেকো।

চোখ মুছতে মুছতে সে চলে গেল।

আমি তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪–এর পত্রিকায় দেখলাম হরতাল চলার সময় একজন প্রথম সারির নেতা কর্মরত অবস্থায় এক মহিলা পুলিশের দিকে ফুল বাড়িয়ে দিচ্ছে আর ওই সম্মানিত পুলিশ তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে এক উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদেরও কাছে এক প্রবাসীর আকুল আবেদন, আপনারা অন্তত এই একটি দিন হরতালমুক্ত রেখে আমাদের স্বাধীনভাবে ভালোবাসার চর্চা করার সুযোগ করে দিন। আর ওজস্বিনী ভাষণের বক্তৃতা দিয়ে বড় বক্তা ও বাগ্মী না হয়ে এই দিনে ভালোবাসার মূল্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন।

আমিও অপেক্ষার প্রহর গুণছি এই ভ্যালেনটাইনস ডে আমার অপ্সরী আমার জন্য কি বার্তা পাঠায়।

কুয়েত থেকে
msn_sky2000@yahoo.com

বিপন্ন ভ্যালেনটাইন

– মিরজা মতিউর রহমান

১৯৬০ সালের কথা। রংপুর কারমাইকেল কলেজের ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। *সম্মিলিত ইউনিভার্সিটি* একাদশের হয়ে করাচিতে *পাকিস্তান ফুটবল প্রতিযোগিতায়* অংশগ্রহণের সুবাদে, সম্মিলিত ইউনিভার্সিটি ব্লেজার গায়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াই কলেজে। কলেজের সেরা অ্যাথলিট, কলেজ ব্লু পেয়েছি। আবার কলেজ ম্যাগাজিনে এবং দেওয়াল পত্রিকায়ও লিখি। দুবার কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে। কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও মাতব্বরি করি। সব মিলিয়ে বেশ একটা রমরমা ভাব। নিজের ভেতরও একটা আতেল ভাব এসে গেছে। অনেকটা *মুই কি হনুরে ভাব।*

২৩ মার্চ। *জমহুরিয়াতই পাকিস্তান* দিবস উপলক্ষে কলেজে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। উপস্থাপনায় আছে কলেজ এবং স্কুল জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজিত রায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও পরিচালক। একটা নাচের পর অজিত ঘোষণা দিল, এবার সঙ্গীত পরিবেশন করছে আমার ছাত্রী, ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী মমতা আজিম।

চমকে তাকালাম। মাঝারি গড়নের শাড়ি পরিহিতা এক তরুণী ধীরে পায়ে এগিয়ে চলেছে মঞ্চের দিকে এলোচুলে। আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যেন ফ্রিজ হয়ে গেছি, অপলকে তাকিয়ে আছি। মনের শত বীণা যেন এক সঙ্গে ঝংকার দিয়ে উঠছে। বলছে, তাকেই যেন চেয়েছি জনম জনম ধরে।

হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে, কুশলী গলায় গান ধরলো মেয়েটি। দর্শক ভর্তি পুরো হল নিশ্চুপ, অভূতপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ছেয়ে গেছে হল, যেন এক সুরের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সারা হলের শ শ শ্রোতা। হুশ হলো, পাশে বসা হোস্টেলের রুমমেট বন্ধু রহমানের কনুইয়ের গুতোয়। এই শা... গান শেষ হয়ে গেছে, হাততালি দে।

চেয়ে দেখি সারা হল হাততালি দিচ্ছে, উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে।

মহারানীর মতো মাতা উচু করে স্টেজ হতে নেমে আসছে মেয়েটি।

কি যে ভূত চেপেছিল আমার মাথায় আজো জানি না। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সিট থেকে উঠে সটান তার সামনে দিয়ে দাড়ালাম। বললাম, চমৎকার গেয়েছেন আপনি। আমার অভি...।

শাট আপ। গর্জে উঠলো মেয়েটি। তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে তার জায়গায় গিয়ে বসলো।

পুরো হল আবার করতালি দিচ্ছে। কেউ কেউ শিয়াল ডাক ডাকছে, সিটি বাজাচ্ছে আমার উদ্দেশ্যে।

লজ্জায় নিচু মাথায় চোরের মতো পা বাড়ালাম হলের বাইরে। তখনো কানে টিপ্পনি এলো, কেউ বলছে, *মজনু যা রাহা হ্যায়*।

গারাজ থেকে সাইকেল নিয়ে হস্টেলের দিকে যাবো ভাবছি। এমন সময় দেখি রহমান আসছে। এসেই আমার ওপর চোট নিল, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছিল? এমন একটা সিন করলি? এই কলেজে এতো দিনের গড়ে ওঠা ইমেজটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলি? আর স্যারেরাই বা কি মনে করলেন তোকে।

গোল্লায় যাক। বলে সাইকেল নিয়ে হস্টেলে এলাম।

ডাইনিংয়ে যেতাম অন্য ছেলেরা খেয়ে যাবার পর। রুম থেকে বের হতাম না, কলেজেও গেলাম না চার দিন। রহমান রায় দিল, এ ভাবে তো ওই পুচকে মেয়েটার কাছে হেরে যাওয়া চলে না। ইনডিয়ার নায়িকা সাবিত্রী চট্টপাধ্যায় অভিনীত *পাশের বাড়ী* ছবির ভোম্বলদার চরিত্র কোট করলো। মেয়েরা শৌর্যের পূজারি। তুইই বা কম কিসে। কলেজের সেরা অ্যাথলিট, ফুটবলে কলেজ ব্লু, চমৎকার ফিগার, কি নেই তোর? ওই মেয়েকে প্রেমে ফেলতেই হবে, ওর ডাট ভেংগে চুরমার করে দিতে হবে।

কমান্ডের ভঙ্গিত বললো, গো অ্যাহেড।

পরদিন থেকে শুরু হলো আমার নতুন জীবন। পোশাক, চেহারায় ঘষামাজা দিলাম। গোফটাকে আরও সুচারু করলাম। পুরনো র‍্যালে সাইকেলটাকে ঘষে চকচকে করলাম।

র‍্যাবের হিম্মত বুকে নিয়ে পরদিন কলেজে গেলাম। কয়েকটা ক্লাস করলাম। প্রোগ্রাম দেখে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস শেষ হলে মমতার রিকশা ফলো করে আবিষ্কার করলাম গুপ্তপাড়ায় তার বাসা। এক তলা সুন্দর একটা ছিমছাম বাসা। সামনে এক চিলতে ফুলের একটা বাগান, বাশের চটার বেড়া দিয়ে ঘেরা। শুরু হলো আমার নতুন রুটিন ওয়ার্ক। আমার ক্লাস শেষ হোক আর না হোক, তার ক্লাস শেষ হলেই তার রিকশাকে ফলো করতাম কখনো তার রিকশার সামনে, কখনো পেছনে।

সে কোনোদিন ফিরেও তাকাতো না। বাসায় পৌছালে রিকশা থেকে নেমে মাথা নিচু করে বাসার ভেতর চলে যেতো।

এক বুক হতাশা নিয়ে হস্টেলে ফিরে আসতাম। রহমানকে রিপোর্ট করতাম।

সে উৎসাহ দিতো, মারফতি ঢঙে মাথা হেলিয়ে বলতো, ব্যাটা, সাধনায় কি না মেলে। চালিয়ে যা, সুদিন এলো বলে।

লেখাপড়া শিকেয় উঠলো। খেলাধুলার প্র্যাকটিসও ছেড়ে দিয়েছি, এমনকি ফুটবলের খ্যাপ এলেও ফিরিয়ে দিতাম। সাধনার রেট বাড়িয়ে দিলাম। অর্থাৎ কলেজ ছুটি থাকলেও সাইকেল নিয়ে অকারণে ওদের বাসার সামনে দিয়ে চক্কর মেরে আসতাম। কোনোদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দেখতে পেতাম ছোট বোনকে নিয়ে বাগানে দাড়িয়ে আছে। অজানা পুলকে মনটা ভরে যেতো। আমার উপর নজর পড়লেই সাপ দেখার মতো চমকে উঠে, ছোট বোনের হাত ধরে বাড়ির ভেতর চলে যেতো।

মনটা হতাশায় ভরে যেতো। ভগ্ন হৃদয়ে হস্টেলে ফিরে আসতাম।

প্রচণ্ড রোদে জামা কাপড় ঘেমে তেলচিটে ধরেছে। কতোদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঝোড়োকাকের মতো সাইকেলে হস্টেলে ফিরে এসেছি!

এতো দিনে হস্টেলের জুনিয়ররা আড়ালে আড়ালে *মজনুভাইয়া* ডাকতে শুরু করেছে।

নিরলস ফিল্ডিং দিয়ে চলেছি রুটিন মাফিক। বছরের শেষ হয়ে। আরেক বছরের বসন্তও শেষের দিকে। মনে এলোমেলো চিন্তার ঝড়। প্রেমের দেবতা অতনুর বর কি পাবো না?

এক বন্ধুর টিপ্পনি, দোস্ত! ১৯৬০–৬১ সালের শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার ঘোষণা করতে যাচ্ছি তোকে।

মৃদু একটা হসি দিয়ে মনের বেদনা চেপে যাই।

সেদিনও যথানিয়মে তার রিকশার পিছে পিছে চলেছি।

মডার্ন মোড়ের আগে গিয়ে তার রিকশা রাস্তার বামপাশে থেমে গেল।

আস্তে আস্তে তার রিকশাকে ক্রস করছি।

হঠাৎ দেখি রিকশা থেকে নেমে সে আমাকে ডাকছে, মতিভাইয়া, দাড়ান। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

চমকে থেমে গেলাম। চারপাশে দেখে নিলাম। রাস্তায় আর কেউ নেই। সামনে গিয়ে দাড়ালাম যেন কাঠগড়ার আসামি।

মাটির দিকে তাকিয়ে, চাপা হিস হিস স্বরে বলে উঠলো, কেন প্রতিদিন আমাকে বিরক্ত করেন? কেন আমার পেছনে ফিল্ডিং দেন? বাসার সামনেও প্রতিদিন ঘোরাঘুরি করেন কেন?

আমি কিছু বলার আগেই আবার বলে উঠলো, শুনে রাখুন কলেজে এসেই যারা প্রেমের ঝাপি খুলে দেয়, আমি সে জাতের, সে রকমের মেয়ে নই।

সে থামতেই আমি সদ্য দেখা *উত্তম সুচিত্রা* অভিনীত *সাগরিকা* সিনেমার কেদারদার ডায়ালগে বললাম, প্রেম যারা করে, ফিল্ডিং যারা দেয়, তারা মেয়ের জাত বা রকম বিচার করে না। মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে, মেয়ে দেখলেই ফিল্ডিং দেয়।

মুখ নিচু করে, ঠোট কামড়ে কি যেন চিন্তা করলো। তারপর বললো, এভাবে নয়, কাল তো কলেজ ছুটি, বিকাল পাচটায় বাসায় আসুন।

স্মার্টলি বললাম, OK. ওকে।

হাওয়ায় উড়ে হস্টেলে এলাম। রহমানকে সব বললাম।

ও আমার পিঠ চাপড়ে বললো, শাবাশ। বলেছিলাম না, লেগে থাকলেই হয়ে যাবে। হলো তো! উহ! কি যে টেনশনে ছিলাম এ দেড়টা বছর, তুই তো শালা প্রেম করেই খালাশ। এবার চলতো বাপধন। অনেক দিন নৃপেনের দোকানের পরোটা, চপ পেটে পড়েনি। আজ বিকেলের নাশতাটা ওখানেই সারি।

বলাই বাহুল্য, চা, নাশতা এবং এক প্যাকেট ক্যাপেস্টান সিগারেটের দাম আমাকে গুণতে হয়েছিল।

পরদিন রহমানের কথামতো ফাটাফাটি ড্রেস পরলাম।

ও টিপস দিল ঘরে মুরব্বি গোছের কেউ থাকলে সালাম দিবি।

যথাসময়ে পৌছে গেলাম আমার *স্বপ্নলোকে*। দেখি, মমতা বাগানে দাড়িয়ে। বললো, আসুন, মুচকি হাসি দিয়ে।

সাইকেল বেড়ার সঙ্গে রেখে অনুসরণ করলাম। ড্রয়িংরুমের খোলা দরজায় দাড়িয়ে দেখলাম এক বৃদ্ধ লোক, দুই যুবক সোফায় বসে। এক পা ঘরে দিয়েছি, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদ সংকেত দিয়েছে।

মমতা বলছে, বাবা, ভাইয়া, এ ভদ্রলোকই প্রতিদিন আমাকে বিরক্ত করে।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি অ্যাবাউট টার্ন, কার্ল লুইসের বেগে বাগান পার হয়ে, সাইকেল নিয়ে হাওয়া।

পয়তাল্লিশ বছরের পুরনো সেদিনটি আজোও ভুলতে পারিনি।

দিনটি ছিল ১ এপৃল ১৯৬১।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

তুমি আমি

- অপস্যা

আমরা মিশিনি ভালোবেসে সব
মানুষ যেভাবে মেশে
আমরা গিয়েছি প্রাজ্ঞ আধারে
না জানার টানে ভেসে।

ভালো আছো তুমি? তোমাকে তুমি বলতেও কি এক লজ্জা আমার অন্তরে, দুই চোখে। তোমার-আমার সম্পর্ক তো আরো কাছের, তুই-এর। কিন্তু আজ মনের কথাটুকু জানাতে তোকে না হয় তুমি বলেই ডাকি।

আমার ভালোলাগা আজ বটবৃক্ষ এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত। তবে কবে তার বীজ বুনেছি তার ক্ষণটা আমার জানা নেই। পড়বে কি তুমি এই লেখা? তোমার অসম্ভব পছন্দের একরোখা অফিসটা কি তোমায় খানিকটা ছাড় দেবে আমার এই লেখাটুকু পড়তে! পড়বে কি চোখে আমার শব্দহীন এই ভাষাটুকু? তবে মন থেকে পাগলের মতো এই পাগলিটা চাইছে তুমি এ লেখাটুকু পড়ো, বোঝো আমার ভালোবাসাটুকু যা আমি সরাসরি তোমায় বলতে পারিনি।

তুমি, তুমি, তুমি আমার সমস্ত সময়গুলোতে এমনভাবে জুড়ে বসলে যে, এখন অন্য সব বড় বেমানান হয়ে গেছে। আমার সমস্ত রাগ, জেদ, অভিমান, আদর, হাসি-কান্না এক তোমাতেই নিমগ্ন। যখন আমার প্রচণ্ড কষ্ট হয়, যখন চারদিকের অশান্তিতে নিজেকে প্রচণ্ড অসহায় লাগে তখন তোমাকে প্রচণ্ড শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেলি। কতোশবার তোমাকে মনের কথাগুলো বলি আর নিজ মনেই হেসে উঠি।

এই আমি আবারও ভালোবাসতে পারবো সব ভুলে তা আমার নিজেরই জানা ছিল না। হয়তো তুমি বলেই সম্ভব হলো। কিন্তু তোমাকে কেন কিছু বলতে পারি না?

তুমি জানো, তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর আজ দুইশ বত্রিশ দিন পার হয়ে গেছে। তাও প্রতিদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার কল্পনাতে, হাটতে-চলতে-খেতে, সেই যে বহুদিন আগে তুমি আমায় তোমার ছবি দিয়েছিল একখানা তার দিকে চেয়ে থেকে, মোবাইলে তোমার ফোন এলে যখন ডিসপ্লেতে তোমার ছবি ভাসতে থাকে, তেমনি আরো কতোশবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

প্রতিদিনই ভাবি, সকালে তুমি আমার বাড়ির পাশের মেইন রোড দিয়ে অফিসে যাচ্ছো আবার রাতে একই পথ ধরে ঘরের ছেলে ঘরে। কি যে সুখ পাই এ ভাবনাতে! কতো কতো দিন সেই রোড আমি বার বার পার হয়েছি তোমার স্পর্শ পেতে। মানুষ চেয়ে হেসেছে। কিন্তু তারা তো আমার অনুভূতি দেখেনি তোমার প্রতি। তাই

অবজ্ঞায় পাগলি ভাবে ঠোট নেড়েছে ঠাট্টায়। আরো কতো কি করি! ছোট ছোট পুতুল কিনি এক একটা উৎসবে। মনে পড়ে – বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে টিশু চেয়েছিলে? সেদিন দিতে পারিনি। তারপরে তোমার জন্য টিশুর প্যাকেট কিনে রেখেছি। যদি আবার কখনো প্রয়োজন হয় তোমার!

তোমার কাছ থেকে ঝগড়া করে ছিনিয়ে নেয়া সেই লাল কলম অতি যত্নে রেখেছি প্রথম দান ভেবে। তোমার ইমেইল, ই–কার্ড আর তোমার সঙ্গের সেই চ্যাটিংগুলো প্রতিদিনই দেখি। তোমার জন্য আমার কতো যে ভয়? হয়তো সেই ভয়কে পাগলির পাগলামি ভেবে হাসো। তাও ভাবতে ভালো লাগে তোমাকে হাসাতে পারি। আমার জন্মদিনে তোমাকে আমার সমস্তটুকু দিয়ে দিয়েছি যা অর্জন করেছি, তা রক্ষা করবো।

যাকে তুমি জান বলো সেই জান তোমাকেও তার জান বানিয়ে ফেলেছে তোমার অলক্ষ্যে। তুমি তো বলো যে, তুমি এই পাগলিটার ডাক্তারের চেয়েও বেশি। তবে কেন তার রোগ বোঝো না?

ভয়, বড় ভয় এই অন্তরে। না গো, সেই ভয় তোমাকে হারানোর না, ভয়টা আমার অন্য কারো হয়ে যাওয়াতে। সেটা আমার জন্যে চরম শাস্তি হবে এই দুনিয়াতে। এতোটা পাপ বোধহয় করিনি তাই না?

দশজনের মতো হয়তো আমাদের সম্পর্কটা শুরু হয়নি। কিন্তু জান তোমাকে চাই অন্য সব ভালোবাসাবাসি মানুষের মতো। সেই রিকশা করে ঘুরে বেড়ানো, সেই ছোট ঝগড়া, রাগ জেদ সমস্ত কিছু ছুয়ে বলছি, তোমাকে ছুয়ে বলছি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।

Nothing to lose!
Nothing to gain!
Froever I made the love only for you,
you are not mine but I think still -
you are mine... Forever!

উত্তরা, ঢাকা থেকে

ভালোবাসানামা

– সাইফুল

ভা–লো–বা–সা। চার বর্ণের এক ম্যাজিক শব্দ। অতি প্রাকৃতিক, দুর্বোধ্য এক উপলব্ধি। ভালোবাসা হলো এক প্রকার সঞ্জিবনী সুধা যা পান করে নর–নারী জীবনকে বিচিত্র অভিধায় উদ্বুদ্ধ ও অভিষিক্ত করে এবং জীবনকে করে তোলে অগ্রগামী ও অর্থময়। নর–নারীর প্রথম জিজ্ঞাসা প্রেম এবং প্রতিনিয়তই তা অভূতপূর্ব এক অনির্বচনীয় সত্য। ভালোবাসাই হলো সৃষ্টির সেরা কারণ। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীনতম, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, স্বপ্নীল এবং ঘোর লাগানো বিষয় হলো ভালোবাসা। এর চেয়ে কমন কোনো বিষয় জগতে বোধ করি দ্বিতীয়টি নেই। সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুজে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একশ আটটি নীল পদ্ম পেলেও আমরা রেডার দিয়ে খুজেও কোনো এমন একজন নর–নারী পাবো না যারা জীবনে একবার হলেও প্রেমে মজেনি বা ভালোবাসেনি। পাশের দোকানের চা বিক্রেতা থেকে শুরু করে খোদ সরকারপ্রধান পর্যন্ত সবাই ভালোবাসার কাঙাল। ভালোবাসাই পৃথিবীর একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে ধনী–গরীব, ছোট–বড়, ধর্ম–বর্ণ–গোত্র নির্বিশেষে সবাই একই কাতারে জমায়েত হয়। ভালোবাসার এমনই মাহাত্ম। কি আশ্চর্য ক্ষমতা এই ভালোবাসার!

অথচ খুব মজার ব্যাপার হলো, সবাইকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভালোবাসা কি? তাহলে ক্ষণিকের জন্য হলেও তারা কিছুটা হকচকিয়ে যাবেন এবং পরক্ষণেই একটু বোকা বোকা হাসি দিয়ে যে যার মতো করে বলে যাবেন। কিন্তু আমরা জানি, ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আজও প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

আসলে ভালোবাসা হলো সম্পূর্ণটাই অনুভূতির ব্যাপার। মনের এক দুর্বোধ্য কোণে এর বসবাস। নির্দিষ্ট কিছু কথা, কোনো ছক, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ দিয়ে এর পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। কবি শামসুর রাহমান এর সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন *প্রেম কি, এই প্রশ্ন যদি কেউ আমাকে করেন তাহলে আমি সবিনয়ে নিরুত্তর থাকবো। কেউ পীড়াপীড়ি করলে সেইন্ট অগাষ্টিনের ধরনে বলবো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি জানি না, জিজ্ঞাসা না করলে জানি।*

ভালোবাসার ক্ষেত্রে রূপ–সৌন্দর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অসুন্দর কোনো পুরুষের জন্য কোনো রমণীর মন ব্যাকুল হয় না আবার অসুন্দর কোনো রমণীর জন্যও কোনো পুরুষের মন আনচান করে না। কাজেই ভালোবাসায় সুন্দর চেহারা একটি বিশাল ফ্যাক্টর। আসলে সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। তাই তো কবি, সাহিত্যিকরা অকৃপণভাবে সুন্দরের বন্দনা করে গেছেন। ইংরেজ কবি কিটস বলেছেন *Truth is beauty, beauty is truth.* তিনি আরো লিখেছেন, *A thing of beauty is a joy for ever.*

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল খুব মজার একটি কথা বলেছেন। তার মতে, A beautiful face is better than all the letters of recommendation in the world.

সত্যিই সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তবে বিপরীতেও কিছু কথা আছে। যেমন ইংরেজিতে একটি কথা আছে, *Handsome is the handsome does.*

এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে মহাত্মা গান্ধী ভালোই বলেছেন, *অন্তরের বিশুদ্ধতার মধ্যেই প্রকৃত সৌন্দর্য বিদ্যমান।*

এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, শারীরিক সৌন্দর্য হচ্ছে *Skin deep* তথা চামড়া সর্বস্ব। অবশ্য এটা শুনে এক মহারথী কিছুটা তেড়ে এসে বলেছিলেন, *কথাটা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। স্কিন ডিপ বলতে কি বোঝায়? ওরা কি চায় সুন্দর একটি প্যানকৃয়াস (Pancreas)।* কি সাংঘাতিক কথা!

যাক, রথী মহারথীদের এমন প্রাণবন্ত তর্কে আমরা যাদের চেহারা–সুরত খারাপ তারা নিশ্চয়ই অজানা আশংকায় কাপছি। কি ভয়ের কথা! চলুন খুব দ্রুত এর সমাধান করতে সচেষ্ট হই।

বাইবেলে একটি কথা আছে, কাউকে কেবল চেহারা দেখেই বিচার করো না। শুধু বাইবেল কেন, সকল ধর্মগ্রন্থেই ভেতরের মানুষটাকে খুজে বের করার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। এখানে মহামতি এব্রাহাম লিংকন–এর ঘটনাটি আমাদের মনে আশার আলো জাগাতে পারে। প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিংকনের চেহারা ছিল খুবই শাদামাটা। এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তার কানে এলো ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলছে, *আরে, এনার চেহারা তো দেখছি একেবারে শাদামাটা।*

লিংকন পাশ ফিরে লোকটির উদ্দেশ্য করে বললেন, *বন্ধু, ঈশ্বর শাদামাটা চেহারার লোকদেরকেই বেশি পছন্দ করেন, সে জন্য অধিক সংখ্যক লোকদেরকেই তিনি শাদামাটা চেহারা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।*

কাজেই ভালোবাসার ক্ষেত্রে চেহারা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোনোক্রমেই তা আবশ্যিক নয়। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আবশ্যিক বিষয় হলো সুন্দর একটি প্রেমিক মন। আপনার মনটা সুন্দর হলেই আপনি ভালোবাসতে পারবেন। মনে রাখবেন, ভালোবাসা যেখানে যতো গভীর হয় সেখানে চেহারা ততোই গৌণ হয়ে পড়ে। এখানে বহুল প্রচলিত একটি গল্পের অবতারণা করা যায়।

এক সুন্দর ছেলে প্রেমে পড়ে যায় একটি কুৎসিত মেয়ের। তাদের ভালোবাসা এতোই গভীর ছিল যে, লোকজন এ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করতো। এই অবস্থায় ছেলেটি তাদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, *আমার চোখ দুটো দিয়ে ওই মেয়েকে দেখুন, তখন বুঝবেন ও কতো সুন্দর।*

এ কারণেই বোধ করি ইরানে প্রবাদ আছে : *ভালোবাসার মুখগুলোকে চন্দ্রালোকিত রাতে দেখতে হয় যখন একজন প্রেমিক–প্রেমিকা তার মনের মানুষকে দেখে অর্ধেক দৃষ্টি আর অর্ধেক কল্পনা দিয়ে।*

মহাকবি শেক্সপিয়ারের একটি কথায় এর প্রমাণ মেলে–*Love looks not with eyes, but with the mind.*

এখন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাবো। বুঝতে চেষ্টা করবো, ভালোবাসলে মানুষের প্রতিদিনকার চালচিত্র কেমন হয়। ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়। ভালোবাসার মানুষ ছাড়া পৃথিবীকে রূপহীন, রসহীন, বৈচিত্র বিবর্জিত মনে হয়। এ সময় প্রতিটি প্রভাত আনে নতুন কোনো প্রত্যাশা, প্রতিটি সন্ধায় ঘটে প্রার্থিত সান্নিধ্য, রাতে থাকে পরবর্তী দিবসের প্রগাঢ় প্রতীক্ষা। কর্মহীন সময়ে নির্জনে ভাবতে ভালো লাগে যে স্মৃতি তা প্রিয়জনের। রাতের তিমির স্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে মনে পড়ে যে প্রসঙ্গ তা প্রিয়জনের। প্রভাতে প্রথম স্মরণে আসে যে মুখ তা প্রিয়জনের। এ এক রহস্য, এক বিস্ময়। আনন্দ–বেদনা বিজড়িত এ এক অনির্বাচনীয় অনুভূতি। মোট কথা, সমস্ত কর্ম–চিন্তায়, ধ্যান–ধারণায়, আলোচনা–সমালোচনায়, স্বপনে–জাগরণে শুধুই প্রিয়জনের একচ্ছত্র আনাগোনা।

এখন প্রশ্ন হলো নিষ্কাম প্রেম, নাকি কামজ প্রেম? কোনটা বেশি কাম্য? নিষ্কাম প্রেমের জয়গান মূলত মধ্য যুগীয় সাহিত্যে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন – মধ্যযুগীয় কবি চন্ডিদাস একটি পদ রচনা করেছিলেন, *রজকিনী প্রেম নিকষিত হেন, কাম গন্ধ নাহি তায়।* সাধক–গায়ক লালন শাহের একটি গানে আমরা নিষ্কাম প্রেমের প্রমাণ পেতে পারি। তিনি বলেছেন, *প্রেম কর আত্মার সঙ্গে, দেহের সঙ্গে নহে।* তেমনি পাশ্চাত্য দেশে *প্লেটোনিক লাভ* বলে একটি কথা বহুলভাবে প্রচরিত আছে।

তবে এর বিপরীত পন্থীরাও কম যান না। যেমন আমাদের দেশের ব্যতিক্রম ধর্মী লেখক হুমায়ুন আজাদ কামজ প্রেমের ঘোর সমর্থক। তিনি তার এক লেখায় বলেছেন, *কোটি বছরের বিশুদ্ধ প্রেমের থেকে একবার একটি পরিপূর্ণ সঙ্গম অনেক বেশি সুখকর।* এদিকে নির্মলেন্দু গুণও কম যান না। তিনি প্লেটোনিক লাভ প্রসেঙ্গ বলতে গিয়ে বলেছেন, *এটি হচ্ছে সুযোগের অভাবে চরিত্রবান ও চরিত্রবতীদের মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফসল।*

যাক, আর কোনো উদ্ধিতি নয়। কারণ তর্কে তর্ক বাড়ে। আসলে কাম, প্রেমের একটি সম্পূরক বিষয়মাত্র। কাম চেতনা দেহ সর্বস্ব এবং ভোগী। কামের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক আর দেহের সঙ্গে আত্মার, অস্তিত্বের, প্রগতির। প্রেম সততই একটি দার্শনিক উপলব্ধি যা মানুষকে দাড় করিয়ে দেয় মহাকালের সব মহা বিস্ময়ের মুখোমুখি। এবং বংশ বিস্তারের কারণ হলো কাম। কাম একান্তই তাৎক্ষণিক, শরীরে সমর্পিত। কামের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক এক আনা। বাকি পনেরো আনাই হলো প্রেম।

প্রেমের পরিণতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রেম, ভালোবাসা মানেই প্রিয়জনকে একান্ত করে কাছে পাওয়া। প্রিয়জনকে নিয়ে স্বর্গ সুখ রচনা করা। প্রেম মানেই প্রিয় মানুষটিকে চিরদিনের মতো ধরে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এতে কেউ সফল হয়, কেউ বা ব্যর্থতার দংশনে নীল কষ্টে ভুগতে থাকে। আসলে প্রেম ও বিরহ মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ। প্রেম যখন আসে তখন বুঝতে হবে বিরহও সমাগত। সফলতা মানেই যে প্রেমের চূড়ান্ত বিজয় এ কথা যেমন সর্বাংশে সত্য নয় তেমনি সংশয় আছে এ কথাটিতেও যে, প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই অমরত্ব লাভের উপায়। তবে দ্বিতীয় মতটির পক্ষে যে ভোট বেশি পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। কেননা প্রেমের সফলতা নিয়ে যে কয়টি কথা খরচ হয়েছে তার চেয়ে বিস্তর কাগজ–কলম গচ্চা গেছে প্রেমের ব্যর্থতার ফিরিস্তি বয়ানে।

তাকিয়ে দেখুন ইতিহাসের দিকে। আপনি চোখ বুজেই বলে দিতে পারবেন *লাইলি–মজনু,* শিরি–ফরহাদ, রোমিও–জুলিয়েট কিংবা দেবদাস–পার্বতীদের মতো অমর জুটিগুলোর কথা। এদের ভালোবাসার কথা, এদের বিরহের কথা আজও লোকমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে ওই অমর নামগুলো। অথচ এরা কেউ সফল নন। কিন্তু প্রেম করে সফল হয়েছেন এমন একটি যুগলবদ্ধ নামও আমাদের হৃদয়ে নেই। আসলে প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই বুঝি সত্যিকারের প্রেমের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দেয়া যায়। আমার সবচেয়ে প্রিয় দুটো শের–এর বাংলা অনুবাদ শোনাচ্ছি :

মেরে রোনেকা জিসমে কিসসা হ্যায়
উমরা কা বেহতোরিন হিস্যা হ্যায়।

অর্থ–আমার কান্নার ভাগ যে অংশে রয়েছে, জীবনের সে অংশটাই শ্রেষ্ঠ – (অজ্ঞাত)।

জিসমে দিল খোয়া উসি কো কুছ মিলা

ফায়দা দেখো উসি লোকসা মে

অর্থ : যে হৃদয় হারিয়েছে সেই কিছু পেয়েছে। এটাই পৃথিবীর একমাত্র লোকসান যাতে আসলে লাভই ভাগ্যে জুটে যায় – (সারসার সালমানী)

দুনিয়াটাই বিশাল এক প্রেমের ক্ষেত্র। এখানে সবাই প্রেমের অদৃশ্য ফাদে আটকা পড়ে যায়। সত্যিই প্রেমের ভুবনে আমরা সবাই একাকার। নিজ বাসভূমে আমরা সবাই প্রেমিক। কেউ জেনে, কেউ না জেনে। কেউ ভেবে, কেউ না ভেবে। আমরা সবাই প্রেমে পড়ি, ভালোবাসি। এখন আলোচনা শেষ করবো। এর আগে দুনিয়ার তাবৎ প্রেমিক–প্রেমিকার উদ্দেশে আধুনিক কবিদের কবি এজরা পাউন্ড–এর *The Spirit of Romance* গ্রন্থের ল্যাটিন কবিতার দুটি চরণ দিয়েই আমার নিবেদন শেষ করছি।

Let who ever never loved, love tomorrow,
Let who ever has loved, love tomorrow.

কাজেই আসুন, সবাই ভালোবাসি। ভালোবেসে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলি শত জঞ্জাল। একমাত্র ভালোবাসাই পারে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করতে।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

এক পশলা বৃষ্টি

– আদিত্য রুপু

প্রতিদিন একটি ছেলেকে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায় শ্রীপুর গার্লস হাই স্কুলের সামনে। ঠিক বিকাল চারটায়, স্কুল ছুটির সময়ে। ছেলেটির নাম দীপক। দাড়িয়ে থাকার একটাই কারণ হচ্ছে ওর হৃদয় রাজ্যের রানী সঞ্চিতাকে এক পলক দেখা। মনের মানুষটিকে এক পলক দেখার জন্য রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিদিন দাড়িয়ে থাকতে হয় দীপককে। এ যেন বিনা বেতনে চাকরি করা আর কি!

সঞ্চিতাকে প্রথম দেখেছিল দীপক এক বৃষ্টি ভেজা বিকেলে। সদ্য যুবতী মেয়েটি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল, কি সুন্দরই না লাগছিল মেয়েটিকে। তার সেই প্রথম দেখাতেই হৃদয়ের মনিকোঠাতে কখন যে সঞ্চিতার নাম লিখে ফেলেছে তা দীপক নিজেও জানে না।

সঞ্চিতার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল আরো ছয় মাস আগে। আর এ ছয় মাসে শুধু নামটি জেনেছে দীপক। অনেকবার ভেবেছে সঞ্চিতার কাছে ছুটে যায়। গিয়ে চিৎকার করে বলে, সঞ্চিতা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু সঞ্চিতাকে দেখলেই দীপক সব কিছু ভুলে যায়।

অবশ্য সঞ্চিতা বুঝতে পেরেছে দীপকের দাড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য। কিন্তু কি আর করা। মেয়েদের *বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না*।

প্রতিদিনের মতো আজও দাড়িয়ে আছে দীপক। হাতে একটা ছাতা। এখন শ্রাবণ মাস। নীল আকাশের কোথাও কোথাও খণ্ড–বিখণ্ড মেঘ ভাসছে। দীপক সামনের দিকে তাকালো। সঞ্চিতাকে আসতে দেখা যাচ্ছে। এক পা দুই পা করে সঞ্চিতা এগিয়ে আসছে। দীপক দূর থেকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো সঞ্চিতার নিষ্পাপ মুখপানে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে সত্যি তুমি নারীদের মধ্যে অতুলনীয়। তোমার তুলনা হয় না। তোমার শরীরের ভাজে ভাজে যৌবনের যে ছায়া দেখছি তা পৃথিবীর অন্য কোনো নারীর মাঝে আছে কি না আমার সন্দেহ হয়। গোলাপি আভা, হরিণের মতো ডাগর ডাগর দুটি চোখ, দুধে–আলতা মেশানো গায়ের

রঙ। সব মিলিয়ে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাদ। জানি না তোমার রূপে কি এমন আকর্ষণ, শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

হঠাৎ কোথে কে চারদিক অন্ধকার করে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। দীপকের ভাবনার অবসান ঘটলো। দৌড়ে গিয়ে সঞ্চিতার মাথার ওপর ছাতাটি মেলেও ধরলো দীপক।

সঞ্চিতা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে, কিছু বলবে দীপক।

দীপক অবাক হলো, সঞ্চিতা আমার নাম জানে! দীপকের মন খুশিতে ভরে উঠলো।

ও নিচু স্বরে বললো, আই লাভ ইউ সঞ্চিতা।

দীপকের কথা শুনে সঞ্চিতা রহস্যময় হাসি হাসলো। তারপর দীপকের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, আই লাভ ইউ দীপক।

সঞ্চিতার কথা শুনে আনন্দে ছাতা উড়িয়ে দিল দীপক।

এক পশলা বৃষ্টি এসে ওদের দুজনকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

রূপনগর, পল্লবী, ঢাকা থেকে

ক থেকে ছ

- লমাকা চৌধুরী

ক

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস গড়ায়, বছরের পর বছর আসে। কখন যে আমি কচি লাউয়ের মতো নিজে পূর্ণ যৌবন পেলাম যাকে এক কথায় বলে লাস্যময়ী রমণী তা জানি না।

রাস্তা দিয়ে হাটলে দুই তিনজন ছেলে এক সঙ্গে বলে, ওই দেখ দেখ, দারুণ মাল যায়।

শুনেও না শোনার ভান করি। কেননা সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে সবার মনমানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। ওই ছেলেগুলোর দোষ দিয়ে লাভ কি? যেভাবে বর্তমান বাংলা সিনেমা তৈরি হচ্ছে তা থেকে আমাদের তরুণরা এর চেয়ে আর কি শিখতে পারে? আমার বোধগম্য হয় না। আগের সেই সিনেমা অবুঝ মন, আখি মিলন, পুত্রবধূ, জীবন থেকে নেওয়া আরো কতো নাম তা এই লেখাতে শেষ করতে পারবো না।

একদিন স্কুল ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছি। পথিমধ্যে দুই তিনজন গ্রুপের একটি ছেলে বললো, এই মাল তোর বুকে দুটা কি?

রাগত স্বরে বলি, তোমাদের কি মা বোন নেই।

তখন ছেলেগুলো উত্তর দেয়, সবাই যদি মা বোন হয় তবে ডার্লিং হবে কে?

আর কোনো কথা বাড়ালাম না। এই ঘটনা যখন আমার বান্ধবী তানিয়াকে বলি, সে আমাকে বললো, আবার যদি তোকে কখনো ওই কথা জিজ্ঞাসা করে তখন আমার এই কৌতুকটা বলবি।

ছেলে : এই মেয়ে তোর বুকে কি?

মেয়ে : তোর বাবার কবর।

ছেলে : আয় জেয়ারত করি।

মেয়ে : দূর থেকে বল আমিন আমিন।

শুনে বললাম, যা তানিয়া, তোর কি মাথা খারাপ? জানিস না ছেলেদের লাই দিলে মাথায় উঠে মুতে দেয়। কলিকাল সম্পর্কে তুই কিছু জানিস না।

খ

অন্যান্য আট দশটা বাঙালি মেয়ের মতো আমার বাবা মা আমাকে যদুর সঙ্গে বিয়ে দেন। অবশ্য বিয়ের আগে বর্তমান প্রথা অনুযায়ী বর-কনে পরিচিত হিসাবে হালকা একটু-আধটু প্রেম যেন হয় সেই ব্যবস্থা হয়েছিল।

কেননা বিয়ের আগে একজন আরেকজনকে না জানলে, না চিনলে অনেক সময় বিয়ের পর মতানৈক্য হতে পারে। তাই এখনকার শত বাবা মায়ের পছন্দ হোক, এই আধুনিক যুগে মেয়ে সম্পর্কে ছেলে এবং ছেলে সম্পর্কে মেয়ে জানতে হবে, তারপর কবুল। এরপরও যদি শান্তি না আসে তা আল্লাহর রহমত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথম দিন তিনি আমার নাম–ধাম বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন।

আমিও আস্তে আস্তে জড়তা কাটিয়ে ফেলি এবং ওনার হাতের বায়োডাটা নিই।

এভাবে বেশ কয়েকদিন হাল্কা হালকাভাবে চলার পর যথাসময়ে আমাদের বিয়ে হয়।

তিনি দারুণ রসিক মানুষ। সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকে এবং বানিয়ে বানিয়ে মজার সব জোকস বলতেন। যেমন –

হাবা : আচ্ছা শালারা দুষ্ট, আর শালিরা মিষ্টি এর কারণ কি?

জবা : শালারা চায় দুলাভাইয়ের কাছ থেকে আইসক্রম, চুয়িংগাম, চকলেট। হাতিয়ে নিতে। ফলে কারণে দুলাভাইয়েরা থাকে অতিষ্ঠ। আর দুলাভাইয়েরা শালিদের পাম দিয়ে গালে টোকা দিয়ে ওদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য বলে, ওহ, তুমি আমার মিষ্টি শ্যালিকা।

শুনলেন তো আমার স্বামী কেমন রসিক মানুষ।

গ

বিয়ের এক সপ্তাহ পরে ওনাকে নিয়ে সীতাকুণ্ড *ইলেকা* পার্কে যাই। কি নয়নাভিরাম দৃশ্য! ওনাকে শাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো ম্যাচিং শু খুব মানায়। মনে হয় যেন বম্বের শাহরুখ খান।

বাদামওয়ালা থেকে বাদাম নিয়ে খোসা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন, লবণ দিয়ে খাও। খুব টেইস্টি। হজমের জন্য ভালো। আচ্ছা, মেয়েরা কেন আগে বলে না, আমি ভালোবাসি তোমাকে।

আমি বলি, সত্যি করে বলবো?

ও বলে, হ্যা, তোমাকে বলতেই হবে।

নিজেদের দাম কমে যাবে বলে।

তিনি হাসতে হাসতে সবুজ ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

এবার বললাম, আচ্ছা যদু ,বলতো দেখি, একটি গাছে দুটি ফল, তার মধ্যে পানির কল। সেটা কি?

সত্যি করে বলবো?

আরে বলো না।

পুংলিঙ্গ।

এবার আমিও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ি।

ঘ

আজ মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ও অফিসে যায়নি। আমিও খুব খুশি, কেননা ও আগের মতো সময় দিতে পারে না। আজ খিচুড়ি রান্না করেছি। এই বৃষ্টির দিনে ভুনা খিচুড়ি খেতে কতো মজা। কি পাঠক ভাইবোনেরা, আপনাদের নাকে কি সুঘ্রাণ লাগছে? জিভ দিয়ে পানি আসছে? আমাদের সঙ্গে কি ভুনা খিচুড়ি খেতে মজা পান তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের সঙ্গে শরিক হোন।

খাওয়া দাওয়া শেষে যদু বললো, অস্ত্র হাসের গল্পটা জানো?

না যদু।

তাহলে শোনো।

হাস : তোমার নাম কি (পুরুষ)?

হাসি : আমার নাম হাসি (স্ত্রী)।

হাস : আয় দুজনে জলে ভাসি।

এটা বলে যদু বললো, আজ ভুনা খিচুড়ি খেয়ে গা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। চলো দুজনে হাসহাসির মতো বাথটাবে ভেসে থাকি।

ঙ

সুখের পর দুঃখ আসে তা নিরন্তন সত্য। যদু এখন আর আমাকে আগের মতো মায়া, মমতা দেখায় না। এরূপ পরিস্থিতির শিকার যে হবো তা আগেই আচ করতে পারি।

একদিন বলেছিলাম, যদু, আমার বড় ভয় হয় যদি কখনো আমাদের ভালোবাসার ঘাটতি দেখা দেয়?

সে আমায় অভয় দিয়ে বলেছিল, মাথা খারাপ।

আজ সত্যি আমার সে যে, বাস্তবে পরিণত হয়েছে। যদু এখন আর আগের মতো ঠিক সময়ে বাসায় ফেরে না। এমনকি মাঝে মধ্যে দুই তিন দিন বাসায় থাকে না।

এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ও বলে, এই মাগী, বাচ্চা দেয়ার মুরোদ নেই, আবার ঢং। এই বলে সে আমার চুলের মুঠি ধরে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয়।

ওর স্বভাব আগের মতো নেই। মুখে যা আসে তাই বলে।

কি করবো? মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হয়। অন্য মেয়ে হলে এই সংসারে লাথি মেরে চলে যেতো। আমি তো আর অন্য মেয়ে নই! কেননা এ বাড়িতে ঢুকেছি লাল শাড়ি পরে যেতে হলে শাদা শাড়ি পরে যাবো।

শুধু দিন-রাত নফল নামাজ, কোরআন তেলোয়াত করছি। আল্লাহর কাছে কেদে বলি, আল্লাহ ওকে রহমত দাও। হয়তো একদিন ওর সুমতি হবে। ওকে কতো বলেছি, চলো দুজনে ডাক্তার দেখাই।

ও বলে, ওগুলো তো বাইক্কা কাম! অন্যদের তো দেখাতে হয় না। হয়তো তুই হারামজাদি কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে খেলা খেলে ওষুধ খেয়েছিস তা না হলে আজ এতো বছর হয়ে গেল তোর পেটে বাচ্চা আসে না কেন?

জানেন পাঠক ভাইবোনেরা, আমার স্বামী একদম একরোখা।

আমি বলি, কতো মানুষের তো কতো দেরি হয়। আল্লাহর হুকুম হলে আমাদের একদিন না একদিন হবে।

আমার শাশুড়ি আমকে কম তাবিজ আর ঝাড়-ফুক দেননি বিভিন্ন ফকির, হুজুর, বৈদ্য থেকে এতে কোনো লাভ হয়নি।

এ নিয়ে তিনি আমায় কম খোটা দেননি।

মাঝে মধ্যে মনে চায় আত্মহত্যা করে জীবনটাকে শেষ করে ফেলি। আবার ভাবি, আমি কেন পরাজিত হবো?

আমার শাশুড়ি প্রতিনিয়ত আমাকে যা-তা বলে নির্যাতন করে থাকেন। আমাকে নীরবে হজম করতে হয়। কেননা গরিবের ঘরে জন্ম আমার। স্বামী তো আছে চুন থেকে পান খসলে অসভ্য মূর্খের মতো আমাকে শারীরিক, মানসিক নির্যাতন করে থাকে। অথচ তিনি একজন গ্র্যাজুয়েট।

আমার মনে হয় রিকশা ড্রাইভারের বউয়েরা আমার চেয়ে অনেক সুখে আছে। কেননা তারা তাদের বৌকে কখনো আমার মতো করে নির্যাতন করে না এবং বৌকে বেশি ভালোবাসে।

মাঝে মধ্যে মনে হয় কেন যে, রিকশা ড্রাইভারের বৌ হলাম না।

এক কথায় তারা বৌ পাগল।

আবার অনেকে বলবেন, রিকশাওয়ালারা তো অনেক বিয়ে করে থাকে।

আরে হাতের সব আঙুল কি এক সমান?

চ

ক্লাস নাইনে পড়া আমার ছোট দেবর সুদর্শন। আমার চোখে জল দেখে বলে, ভাবী প্রতিদিন কি নিয়ে ভাইয়ার সঙ্গে এতো ঝগড়া হয়, আমার ভালো লাগে না। তোমার কি দুঃখ আমায় বলো না। আমি কি তোমার দুঃখে শেয়ার হতে পারি না যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তোমার দুঃখগুলো দূর করে দেবো।

এই বলে সে আমার দুই গালে, কপালে চুমু খেলে আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। আমিও তার গালে, কপালে চুমু খেয়ে শক্ত করে আকড়ে ধরে বলি, ছোট ভাই, তুই আমার জান, তুই আমার পরাণ, তুই আমাকে এতো ভালোবাসিস!

প্রায়ই মাঝে মধ্যে তাকে ভোগ করতাম।

কখন যে গর্ভবতী হয়ে পড়ি নিজেই আচ করতে পারিনি।

যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলাম।

ছ

এখন আর আমাকে পাড়া-পড়শিরা অন্য চোখে দেখে না। এতোদিন সবার বাকা চোখে ছিলাম।

কেউ আমার সঙ্গে সহজে মিশতে চাইতো না।

শাশুড়িআম্মা আর আমার স্বামী আমাকে আর কটু কথা বলেন না, নির্যাতনও করেন না।

এখন আমি সবার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেলাম। স্বামী আমার নিয়মিত বাসায় ফেরেন। এখন তিনি বৌ পাগল। ঘর থেকে বের হন না। বাবুকে নিয়ে সারাক্ষণ আনন্দে মেতে থাকেন।

মাঝে মধ্যে মনে হয়, স্বামীকে সত্য কথা বলে ফেলি।

কিন্তু আমার দেবর আমার হাত তার মাথায় রেখে বলে, ভাবী, তুমি যদি কখনো এই গোপন কথা প্রকাশ করো এবং কাউকে বলো, খোদার কসম, সত্যি সত্যি পুকুরে ঝাপ দেবো। তুমি তো জানো আমি সাতার জানি না।

আমি বলি, হায় পাগল! তুই আমায় এতো ভালোবাসিস।

তাই বলি পাঠক ভাইবোনেরা, এমন কপাল কয়জনের ভাগ্যে আছে!

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন চট্টগ্রাম থেকে

একজন লিওভাই

– আর্চি

পাশের বাড়ির লিওভাইয়ের ছায়া সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম জীবনের সেই প্রথম লগনে। সে তো তখনকার কথা যখন আমার উচ্চতা লিওভাইয়ের পড়ার টেবিল বরাবর, টেবিলের ওপর মোটা মোটা বই এবং বইয়ে নিবদ্ধ লিওভাইয়ের চোখ-মুখ ছাড়া কিছুই নজরে আসতো না। হিংসা হতো, ও রকম মোটা বই কখন যে আমি পাবো!

অবশ্য নিজের নাম তখন লিখতে শিখেছি। কাজেই সুযোগ মতো সেসব বইয়ে গোটা গোটা অক্ষরে নিজের নামটি লিখে অধিকার জারি করে রাখতাম।

লিওভাই কখনো কিছুই বলতেন না।

আমিও সারাক্ষণ তার সঙ্গে লেপ্টে থাকতাম।

লিওভাই পুকুর ঘাটে তো আমি তার কাপড় পাহারা দিচ্ছি। লিওভাই খেতে বসেছেন তো আমি তার সঙ্গে খাচ্ছি। অনেক সময় তিনিই আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন। লিওভাই পড়ছেন তো আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

কিন্তু সব কিছুরই তো শেষ আছে। ফলে একদিন লিওভাইয়েরা যখন চলে গেলেন ঢাকায় তখন পড়লাম বিছানায়। অবস্থা এমন হলো যে, শেষে লিওভাইকে ডেকে পাঠালেন মা।

একদিন খুব ভোর বেলায় তিনি এলেন। মায়ের সঙ্গে আমার বিছানার কাছে এসে ডাকলেন, আর্চি। এই যে আর্চিমণি, দেখো তো কে এসেছে!

চোখ খুলে তাকিয়েই এক লাফে লিওভাইয়ের গলা ধরে তার কোলে স্থিত হলাম। সারা দিন তার সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন সকালে নিজেই গিয়ে তাকে স্টিমারে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম এক প্যাকেট বিস্কিট হাতে।

যতোদিন নিজে লিখতে শিখিনি ততোদিন মা এবং বড়দির মাধ্যমে যোগাযোগ চালু থাকলো। পরবর্তীকালে আমরা ঢাকা এলে তিনি প্রায়ই বাসায় আসতেন।

লিওভাই আমাদের পরিবারে বড় ছেলের মতোই অধিকার ভোগ করতেন। আমাদের একাধিক ভাইবোনের নামও তার দেয়া। তার সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ানো, তার সঙ্গে সিনেমা দেখা প্রায়ই হতো। অত্যন্ত মধুর এবং অত্যন্ত শালীন একটি সম্পর্ক তিনি বজায় রেখেছিলেন।

এরপর তিনি লেখাপড়ার জন্য চলে গেলেন বিদেশে। মাঝে মধ্যেই তার আর্চিমণিকে লিখতেন। সে-সব চিঠিতে কোনো আবেগ-উচ্ছ্বাস না থাকলেও চিঠিগুলো একা পড়তে আনন্দ পেতাম।

দেশে ফিরে একদিন তিনি আমাদের বাসায় এলেন। সেদিন বড়দির শ্বশুরবাড়ির অনেক অতিথি বাড়িতে ছিলেন। পুরো দুই দিন হই চই করে এক সঙ্গে কাটানোর পরও আমরা কেউ-ই কিছু ব্যক্ত করতে পারিনি। তিনি ফিরে গেলেন।

একদিন তার মেজদির বাসায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর পছন্দের কেউ আছে?

জীবনের চরমতম ভুলটি সেদিন করলাম।

বললাম, না। নেই।

তারও দুই বছর পর তখন ইউনিভার্সিটির হলে তার বিয়ের খবর পেলাম। উন্মাদ হলাম, উতলা হলাম, উদভ্রান্ত হলাম। তাকে ডেকে পাঠালাম।

তিনি এলেন। হল থেকে আমাকে তুলে নিলেন। একটি রেস্টুরেন্টে বসে কথা হলো। শুধু বলতে পারলাম, লিওভাই, আমি আশা করেছিলাম...। বাকি কথা চোখের জলেই ভেসে গেল।

তিনি শুধু বললেন, আর্চি, তুই আমার সর্বনাশ করেছিস। আমার জীবনটা তো তুই তছনছ করে দিলি। হাতে হাত রেখে বললেন, তোর লিওভাই তোরই ছিল, তোরই আছে, তোরই থাকবে।

ইতিমধ্যে জীবন গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়েছে। আমারও হলো একটি জমজমাট পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনির বিত্তবান সংসার। কিন্তু হঠাৎ করেই আমার দেবতুল্য স্বামী অকালে মৃত্যুবরণ করলেন। আমি নোঙ্গর হারালাম।

একা হলাম, নিঃসঙ্গ হলাম। তখন থেকেই মনের মণিকোঠায় নিরুপদ্রবে অধিষ্ঠিত লিওভাইয়ের অস্তিত্ব অনুভবে আসতে লাগলো। না, আমি স্বামী, পুত্র-কন্যা কাউকেই ফাকি দিইনি, বঞ্চিতও করিনি।

আজ জীবন সায়াহ্নে একাকীত্বের যন্ত্রণা আমাকে আবার উতলা করেছে।

জানতে ইচ্ছা করে লিওভাই, আপনি কি এখনো আমার আছেন?

ভোলা থেকে

আচল

– সৈয়দ কাদের নওয়াজ

ঢাকা শহরের মুগদাপাড়ায় থাকি। চাকরিসূত্রে এখানে থাকা। খুলনা শহরে আমার বাড়ি। সেখানেই আমার পরিবারের অন্য সদস্যরা থাকেন। মুগদাপাড়ায় কোনো মেসে থাকি না। থাকি একা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। একটা কাজের মেয়ে আছে। দুবেলা রান্না করে দেয়। বাকি টুকটাক কাজ নিজেই করে নিই। কারণ সকাল বিকেল অফিস করা ছাড়া সারা দিনে আর তো কোনো কাজ থাকে না।

মুগদাপাড়ায় আমার এক শুভাকঙ্ক্ষী থাকেন। নাম শফিক উদ্দীন। তিনি সদরঘাটে এক কম্পানিতে চাকরি করতেন। সম্প্রতি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। তিনি সব সময় আমার খোজ খবর নেন। আমার সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখেন। কোনো কারণ নেই, অকারণেই তিনি আমার ভালো চান, আমি ভালো আছি দেখতে চান। পৃথিবীতে কিছু সহজ–সরল মানুষ আছে। যদিও চালাক মানুষেরা তাদের বোকা বলে। আমার মনে হয়, শফিক উদ্দীন সেই বোকা মানুষদের দলে।

তার বড় মেয়ে বিএ পাস করে বেশ কিছু দিন পড়লেখা বন্ধ রেখেছিল। এখন আবার এমএ পড়ছে। তার বাপের ইচ্ছায় মেয়েটা আমার কাছে ইংরেজিটা দেখিয়ে নিতে আসে। তার আসার কোনো সময় নেই। আমার মতো এই বয়স্ক লোকের কাছে সে যে কোনো সময়েই চলে আসে।

বেশ মিশুক ও সহজ–সরল মেয়ে, কর্মঠও। যখনই আসে, নিজের ইচ্ছায় আমার অনেক কাজ করে দেয়। আমার নিষেধ শোনে না। অগোছালো ঘরটা গুছিয়ে দেয়। বইপত্তরের ওপর জমে থাকা ধুলো ঝেড়ে মুছে দেয়। কখনো কিছু একটা খাবার তৈরি করে দেয়। চা করে। মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে এটা–ওটা নিয়ে এসে খাওয়ায়। গুন গুন করে গান গায়। প্রথম প্রথম আপনি আপনি বলতো। এখন তুমি বলে। আধুনিকরা আপনি বলাটা পছন্দ করে না।

মেয়েটির নাম আচল।

এক অর্থে শিক্ষক হলেও আমি তার বন্ধুর মতো।

একদিন আচল বললো, ভাবছি তোমার চুলে কলপ দিয়ে তোমাকে আরেকবার বিয়ের কলেমা পড়াবো।

পাত্রী কোথায় পাবে? জবাব দিলাম।

রঙ মাখা মহিলা অনেক আছে। প্রায়ই চোখে পড়ে। তোমার ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। সরকারি চাকরি করো। তোমার পাত্রীর অভাব হবে না। বুকের ছাতিটা এতো চওড়া করলে কি করে? কলেজ জীবনে প্রেম করার জন্যে ব্যায়াম করতে বুঝি!

আরে না, দুঃখ সইতে হবে বলে আল্লাহপাক আমার বুকের ছাতিটা চওড়া করে দিয়েছেন। হাসতে হাসতে জবাব দিলাম।

আরেকদিন সে এলো হাতে বেশ কিছুটা উল নিয়ে। বললো, দেখো, এই মরা মরা রঙটা তোমার পছন্দ কি না!

আমার পছন্দে কি হবে? উত্তর দিলাম।

সোয়েটারটা যে তোমার জন্যেই বুনবো।

আমার জন্যে?

জি। এতোদিন দেখছি, কেউ তোমার কাছে আসে না, কিছু দেয়ও না। আমি না হয় একটা সোয়েটারই বুনে দিলাম।

তুমি এতো কষ্ট আর টাকা খরচ করতে যাচ্ছ কেন?

বেশি করে পড়িয়ে শোধ করে দিও।

এখন বসে বসে উলের গোল্লা পাকাও। আমি চা করি। বিকেলে চা, টা কিছু জুটেছে?

ভুলে গেছি।

ভুলে গেছি মানে? খেয়ে ভুলে গেছো, না ভুলে খাওনি। কোনটা?

দ্বিতীয়টা।

ভালো। খুব ভালো। কোল্ড এলার্জির ওষুধ এনে দিয়েছিলাম। খাচ্ছ, না তাও ভুলে বসে আছো!

মনে পড়লে খাই, ভুলে গেলে খাই না।

সত্যিই দেখছি ঢাকাতে তোমার আরেকটা বিয়ে দিতে হবে। তোমার মতো অবাধ্য মানুষকে যাতে চব্বিশ ঘণ্টা শাসনে রাখা যায়। না হলে শ্বাস কষ্টে কোনোদিন মারা যাবে।

আরেকদিন সন্ধ্যায় টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে।
আচল এলো। হাতে একটা ঠোঙা। জিজ্ঞাসা করলো, তোমার পেটের খবর কি?
বললাম, ভালো না।
ভালো হবে কি করে! এই বয়সে খালি খাই খাই। বাইরে গেলেই তো এটা খাবো, ওটা খাবো করো।
বাইরে গেলেই এটা খাবো ওটা খাবো করি তা তুমি জানলে কি করে?
কেন? আব্বু বলেছেন। আব্বু আর তুমি যখন বাইরে ঘুরতে যাও তখন তুমিই নাকি বেশি খাই খাই করো এবং বাইরের আজেবাজে খাবার কিনে খাও। ঠিক আছে, সত্যি করে বলো তো এখন কি খেতে ইচ্ছে করছে?
গরম পেয়াজি আর মুড়ি।
ঠিক বুঝেছি। মা পেয়াজি ভাজছিলেন। তোমার জন্য কয়টা নিয়ে এলাম।
সে গত শুক্রবার সকালে এসে মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়লো। টুলে উঠে পাখার ব্লেড পরিষ্কার করলো।
সাবধান করে বললাম, পড়ে যেও না যেন।
হাসতে হাসতে জবাব দিল, তুমি আছো কি করতে? পড়ার মতো হলে ধরবে।
তুমি আমার জন্য এতো করো কেন আচল? কেউ তো আমার জন্য কিছু করে না।
কিছু বোঝো না, মোটা মাথায় এটাও ঢোকে না। তোমাকে আমার ভালো লাগে, মায়া লাগে তোমার জন্য, মায়া।
সেদিন আচল এলো। গম্ভীর। তার চেহারা মলিন। খাটে আমার মুখোমুখি বসলো। তার মায়াবী মুখ। খাড়া নাক। টানা টানা চোখ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো আমার মুখের দিকে। আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে আচল?
দুই গাল বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরছে।
হতবাক আমি। কি হলো আচল, কেউ কিছু বলেছে?
ঝুকে পড়লো আমার কোলে। কান্নার আবেগে ফুলছে আচল। খোপা ভেঙে পড়েছে। অনেক পরে বললো, আমার বিয়ে।
সে তো আনন্দের কথা। ভীষণ আনন্দের। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।
আচল আমার কোলে মুখ গুজেই বললে, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।
পাগল মেয়ে। আমরা সকলেই সকলকে ছেড়ে থাকতে পারি। একদিন দুই দিন একটু খালি খালি লাগবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।
সস্নেহে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম।
আচল মুখ তুলে তার আচলে চোখ মুছলো। বললো, তোমার খারাপ লাগছে না?
লাগছে। আমার শূন্যতার গভীরতা আরো বেড়ে গেল যে!
তার মানে?
একা থাকি। আমাকে ঘিরে থাকে শূন্যতা। তুমি কিছু দিন সঙ্গ দিয়ে আমার শূন্যতাকে পূর্ণ করেছিলে। এখন আবার সেই শূন্যতা।
কিছু করা যায় না?
কি করতে চাও?
বিয়েটা বন্ধ করতে।
বিয়ে বন্ধ কররে লাভ কি? একদিন না একদিন বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে। সেক্ষেত্রে শুভ কাজ যতো শিগগির করা যায় ততোই ভালো।

তাহলে কিছুই করা যায় না?

না, কিছুই করা যায় না।

আচল উঠে পড়লো। রাগ মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, তোমার সোয়েটার হয়ে গেছে। আব্বুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

আচল চলে গেল ধীর পায়ে।

আমি আচলের চলে যাওয়া দেখলাম।

দক্ষিণ টুটপাড়া, খুলনা থেকে

গ্লানি

– ঝিনুক

একটি গরিব ঘরের যা অবস্থা হয়, আমার ঘরের অবস্থাও তা–ই ছিল। আমার স্বামীর চাকরি চলে গেছে কয়েক মাস হলো। ঘরে পনেরো বছরের একটি ছেলে এবং ছোট দুটি মেয়ে। আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। পয়সার অভাবে সন্তানদের লেখাপড়া চালানো অসম্ভব। ছেলেটি এলাকার খারাপ ছেলেদের সঙ্গে চলে। সে প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরে। আর আমার স্বামী হলো মাতাল ও জুয়াড়ি। ঘরে যে কিভাবে অন্ন সংস্থান হবে তা জানার প্রয়োজন সে মনে করে না।

আমি দেখতে খুবই সুন্দরী। কিন্তু আর্থিক দুর্দশা এবং ঠিক মতো না খেতে পেরে আমার চাদের মতো মুখশ্রীতে যেন গ্রহণ লেগেছে।

আমার ঘর থেকে কিছু দূরে শ্যামলদের বাড়ি। শ্যামলের পেশাটি ছিল অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির। হোটেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। রাতে হোটেলে মেয়েছেলে যোগান দিতো।

একদিন শ্যামল আমার ঘরে এসে বললো, বৌদি, এরকমভাবে আর কতো দিন চলবে? ভাইসাহেব তো কোনো কাজের ধান্দা করে না। আপনার ছেলে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে সারা দিন ভবঘুরে হয়ে অসৎ সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। কিছু দিন পরে আপনার মেয়েরাও যুবতীতে পরিণত হবে। তারপর তাদের বিয়ের জন্যও চিন্তা করতে হবে। আপনার স্বামী তো ছেলেমেয়েদের প্রতি কোনো খেয়ালই রাখে না। সুতরাং আপনাকেই ওদের কথা ভাবতে হবে। আপনি আপনার স্বামীকে কিছু না বলে কোনো ছোটখাটো কাজ নেন না কেন।

কিন্তু আমি কি করতে পারি?

ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য কোনো কাজের সন্ধান করবো।

পরদিন শ্যামল ফের আসে। এবারে তার চেহারায় ছিল খুশির ঝলকানি আর উদ্দেশ্য পূরণের আশা।

নমস্কার বৌদি। বলে সে ঘরের এক কোণে বসে পড়ে।

সে গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করে, দেখুন বৌদি, আমি অনেক বিচার বিবেচনা করার পর আপনার জন্য এমন একটা কাজের সন্ধান করেছি যাতে হলুদও লাগবে না, ফিটকিরিও লাগবে না এবং রঙও বেশ খুলবে। হাজার হাজার টাকা উপার্জনের সঙ্গে কিছু বখশিশও মিলবে।

এটা কি ধরনের কাজ? আমি খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

যদি আপনি সাহস করে অন্য ব্যক্তিদের খুশি করেন তবে আপনার সমস্ত দুঃখ–কষ্ট ঘুচে যাবে। আপনি মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করতে পারবেন। আপনি এমনই আকর্ষণীয় যে, কোনো পুরুষ আপনাকে দেখে প্রেমে পাগল হয়ে যাবে।

মনে মনে বলতে থাকি এই বদমাশ শ্যামল কি যা তা বকবক করে চলেছে? খুব রাগ হয়। সংযম হারিয়ে ফেলি। শ্যামলকে ঘর থেকে চলে যেতে বলি।

শ্যামল চুপচাপ উঠে দাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যাবার আগে আমাকে বলে যায়, দেখুন, এতে আমার তো কোনো লাভ হবে না, আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম।

শ্যামল চলে যাওয়ার পর আমার কানে তার উচ্চারিত শব্দগুলোর গুঞ্জন উঠতে থাকে। আমার মাথা ঘুরতে থাকে।

রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না। ভেবে ভেবে যেন পাগলের মতো হয়ে গেলাম। শ্যামল যে পরামর্শ দিয়েছে, আমি কি তাই করবো? নিজের দেহ কি করে বিক্রি করতে পারি? এটা তো পাপ। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের কি হবে? ওদের তো সামান্য কিছু খাবারও ভাগ্যে জুটবে না। তাহলে কি করবো? তবে কি পাপের পথেই চলবো?

অবশেষে স্থির করি যে, ওই নতুন রাস্তাতেই চলবো।

পরের দিন নিজেই শ্যামলের বাড়িতে যাই এবং ওই নতুন পেশা নেয়ার জন্য রাজি হই।

সে বলে, আপনি খুব ভালো করেছেন বৌদি। এবার দেখুন দারিদ্রতা কেমন করে আপনার ঘর থেকে দ্রুত বিদায় নেয়। আসল কথা হলো যেসব পর্যটক বা যাত্রীরা বহুদূর থেকে এসে হোটেলে আশ্রয় নেয় তারা রাতটাকে রঙিন করার জন্য একজন মেয়ে মানুষের দেহ কামনা করে যা তাদের বাড়ির দুশ্চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। যদি আপনি কিছুটা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যান তবে ধনী লোকেরা এর জন্য আপনাকে অনেক টাকা দেবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় হোটেলে আসার কথা বললো।

আমি লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, পরপুরুষের সামনে কি করে যাবো? দুরুদুরু বুকে হোটেলের সিড়ির ওপর পা রাখলাম।

শ্যামল আমাকে নিয়ে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলো।

তিনি আমার হাতে রুমের চাবি দিয়ে বললেন, পয়ত্রিশ নাম্বার ঘরে চলে যাও আর অপেক্ষা করো।

রুমে আসার পর শ্যামলও রুমে আসে। কিছু কাজের কথা এবং খদ্দেরকে খুশি করার কিছু কৌশল ও পদ্ধতির কথা বলে সে চলে যায়।

নিজের অন্তরাত্মাকে এক রকম খুন করার পর একজন কলগার্লে পরিণত হই।

পাচ বছর এভাবে হাসি–খুশির মধ্যে কেটে গেল।

একদিন ম্যানেজার রুমের চাবি দিয়ে বলে, চারজন যুবক আছে, কোনো প্রকার চেচামেচি বা গণ্ডগোল যেন না হয়। রুমে গিয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘাটের ওপর বসে পড়ি। বার বার পর্যায়ক্রমে তিন যুবক কামরায় আসে এবং তারা আমাকে ভোগ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

চতুর্থ যুবকটি যখন রুমে এলো তখন আমার চেতনা যেন লোপ পেয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গলায় যেন আমার কাটা বিধে গেল। বড় বড় চোখ করে যুবকটিকে দেখতে থাকি।

এ যে আমারই ছেলে! আমার চড়া মেক আপের জন্য সে আমাকে চিনতে পারেনি।

তখন মনে মনে বললাম, হায় ভগবান, এই দৃশ্যও আমাকে দেখতে হলো? আমার দেহের খরিদ্দার কি না আমারই ছেলে।

আমার ছেলেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিই এবং ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে হোটেলের ব্যালকনি থেকে নিচে ঝাপ দিই।

তারপরও সেদিন প্রাণে বেচে গেছি।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কলাবতী ও পুণ্য স্নান

– আশফাকুল জলিল

এলাহাবাদ। গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী নদীর মিলনস্থল।

হিন্দু ধর্মীয় মতে বিশেষ তীর্থ স্থান।

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ত্রিবেনী সঙ্গমে স্নান করা হয়। তবে বারো বছর অন্তর আসা বিশেষ তিথিতে স্নান করলে অতিরিক্ত পুণ্য মেলে। আর একশ চুয়াল্লিশ বছরে একবার আসে মহাকুম্ভ।

এবারে সেই মহাকুম্ভ তিথি এসেছে। তাই ত্রিবেনী সঙ্গমে স্নান করে পাপ মোচনার্থে অসংখ্য পুন্য লোভী মানুষের আগমন হচ্ছে। ভারতবর্ষের নানান স্থান, এমনকি অন্যান্য দেশ থেকে আসা নানা জাতি ও ভাষার মানুষের এক অভূতপূর্ব মিলনে জমে উঠেছে মেলা। এই বৈচিত্রপূর্ণ সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য কাক ডাকা ভোরে এলাহাবাদ রেল স্টেশনে নামলাম।

স্টেশন থেকে মেলাস্থলে যাবার প্রচুর বাসের ব্যবস্থা থাকলেও ভিড়ের জন্য ওঠা সম্ভব হলো না। তবে তীব্র শীতে গরম চা পান খেয়ে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে হেটে মেলাস্থলের দিকে যেতেও মন্দ লাগছিল না।

মেলায় পৌছে খানিকক্ষণ খোজ করতেই একটা তাবুতে থাকার জায়গা জুটে গেল। ছোট্ট তাবু। পাচটি দোতলা দড়ির খাটিয়াতে দশজনের থাকার ব্যবস্থা। জিনিসপত্র তাবুর কেয়ারটেকারকে বুঝিয়ে দিয়ে তিন নদীর সঙ্গমস্থলের দিকে চললাম।

নদী তীরে প্রচণ্ড ভিড়। ঘন কুয়াশার চাদর সবে সরতে শুরু করেছে। গায়ে শাদা ভুষি মেখে নগ্ন সন্ন্যাসীরা দল বেধে স্নানে নেমেছে, সাথে অন্যরাও।

এই নগ্ন সন্ন্যাসীরা জৈন ধর্মের অনুসারী। বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রবর্তক। আনুমানিক খৃষ্ট জন্মের পাচশ চল্লিশ বৎসর আগে মহাবীরের জন্ম হয়। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে স্ত্রী যশোদা এবং একমাত্র কন্যাকে ছেড়ে তপশ্চর্যায় ব্রতী হন। বারো বৎসর ভ্রাম্যমাণ জীবনে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি একটি মাত্র পোশাক সম্বল করে তেরো মাস কাটান। পরে সেটিও বর্জন করে জীবনের অবশিষ্ট কাল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেন। সংসার ছেড়ে দেয়ার তেরো বছর পরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে *জিন* বা *বিজেতা* এবং *মহাবীর* আখ্যা লাভ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বের শেষ দিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনেক সন্ন্যাসী গঙ্গা তীর ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। তাদের এ মাইগ্রেশনকে কেন্দ্র করে জৈনদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। মহাবীরের অনুশাসন মাইগ্রেশনের নেতা ভদ্রবাহু কঠোরভাবে মনে চলতে চান এবং জৈনদের সম্পূর্ণ নগ্নতাকে সমর্থন করেন। এর ফলে তিনি ও তার অনুসারীরা *দিগম্বর* নামে খ্যাত হন। অপরদিকে স্থূল ভদ্রের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে থেকে যাওয়া জৈনরা শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার সমর্থন করেন এবং *শ্বেতাম্বর* নামে পরিচিত হন।

ভিড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাটতে হাটতে এক পর্যায়ে আমিও নদীর হিম শীতল জলে নেমে পড়ি। তিন নদীর সঙ্গমস্থল বলা হলেও বর্তমানে শুধু গঙ্গা আর যমুনা নদীকেই দেখা যায়। অনেক কাল আগে এখানে সরস্বতী নদী অবস্থান করলেও ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে অসংখ্য পর্বত জেগে উঠেছে। কথিত আছে যে, সরস্বতী নদী সেই সমস্ত পর্বতমালার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে ভূগর্ভে অবস্থান করে গঙ্গা, যমুনার মিলনস্থলে সংযুক্ত রয়েছে।

এই তিন নদী তাদের জন্ম সূত্রে হিন্দুদের কাছে বিশেষ স্থান পেয়ে আসছে।

গঙ্গা

মহাভারত আদিতে আছে – দেবর্ষি নারদ রাগ রাগিণীযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ হলেও তার ত্রুটির জন্য সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ হয়ে যেত অথচ তা তিনি স্বীকার করতেন না। নারদকে শিক্ষা দেয়ার জন্য রাগ রাগিণীরা বিকলাঙ্গ নর–নারীর

রূপ নিয়ে পথে পড়ে থাকে। নারদ তাদের দেখে বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণ জানতে চান। নিজ ত্রুটির কথা জানতে পেরে রাগ রাগিণীর এমন বিকলাঙ্গ দূর করার উপায় শুনতে চান। উত্তরে তারা জানায় যে, মহাদেব স্বয়ং এসে সঙ্গীত শোনালে তারা পূর্ব দেহ ফিরে পাবে।

নারদ মহাদেবকে গান গাইতে রাজি করান। তবে গান শোনার জন্য মহাদেব ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকার শর্ত দেন। পুণ্য বলে নারদ তাদের নিয়ে আসেন। মহাদেবের গান শুনে রাগ রাগিণীরা সুস্থতা পায়। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম ব্রহ্মা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। বিষ্ণু তার সঙ্গীতের মর্ম কিছুটা নিতে পেরেছিরেন বলে দ্রবীভূত হয়ে যান। ব্রহ্মা দ্রবীভূত বিষ্ণুকে হাতের তালুতে রক্ষা করেন। পরে সগীর বংশীয় রাজপুত্র ভগীরথ ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গঙ্গা নদী রূপে মর্তে নিয়ে আসেন। গঙ্গাই বিষ্ণু অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান। তাই গঙ্গা বা তার জল হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র।

যমুনা

মার্কেন্ডেয় পুরাণে আছে, বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্যের তেজে চোখ নিমীলিত করে রাখতেন। এতে ক্রুদ্ধ সূর্য তাকে এই অভিশাপ দেন যে, সংজ্ঞা চোখ মেহন করছেন। তাই তার গর্ভে যে পুত্র হবে সেই পুত্র প্রজা মেহনকারী যম হবে অর্থাৎ প্রজাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে। সূর্যের এই অভিশাপে ভীত সংজ্ঞা স্বামীর প্রতি চপলভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

সূর্য তখন বললেন, আমার প্রতি চঞ্চলা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে তোমার যে কন্যা হবে সে চঞ্চল নদীতে পরিণত হবে।

যথাকালে কন্যার জন্ম হলে কন্যাটি পিতৃ অভিশাপে কালিন্দ পর্বত হতে চঞ্চল স্বভাবা নদী রূপে নেমে আসে।

সরস্বতী

মৎস্য পুরাণে আছে, ব্রহ্মা নিজ মুখ থেকে শুক্ল বর্ণা বীণাধারিণী এবং চন্দ্রের শোভাযুক্তা এক কন্যা সৃষ্টি করেন যার নাম সরস্বতী। ব্রহ্মা নিজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। এর ফলে সরস্বতী গর্ভবতী হন এবং মনু নামের পুত্র প্রসব করেন। মনুর পুত্র–কন্যা হতে মনুষ্য জাতির বিস্তার হয়। তাই তারা মানব। সরস্বতী থেকে মানব সৃষ্টি ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু। ফলে তিনি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

এই তিন অতি গুরুত্বপূর্ণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাপ মোচন করে তাবুতে ফিরে এলাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। তাই দেরি না করে চিড়া–দই খেয়ে দড়ির খাটে শুয়ে নিদ্রা গেলাম।

কিন্তু পাশের তাবু থেকে নারী কণ্ঠের উচ্চস্বরে বিলাপ ভেসে আসাতে সহসা ঘুম ভেঙে গেল। কি হয়েছে দেখতে পাশের তাবুতে প্রবেশ করলাম। ভেতরে আধো অন্ধকারে একটি কম বয়সী মেয়ে বসে, পাশে এক বৃদ্ধা। ইশারায় বৃদ্ধাকে ডেকে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে? আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?

তিনি বললেন, এই দেখুন না, কাল থেকে মেয়েটা কিছু মুখে দেয়নি। দুধ ছাড়া কিছু খেতেও চাইছে না, তাও ফুরিয়ে গেছে। তাবুতে অন্য কেউ নেই, একা থাকতে ওর বড় ভয়। ওর জন্য দুধ আর আমার জন্য খাবার কোনোটাই আনতে যেতে পারছি না।

বললাম, ঠিক আছে, আমি দুধ আর খাবার এনে দিচ্ছি। আপনি বরং ওর কাছেই থাকুন।

দোকান থেকে গরম দুধ আর লুচি ভাজি নিয়ে এলাম। ওগুলো বৃদ্ধার কাছে রেখে চলে আসছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে তাবুর বাইরে এসে খাবারের দাম দিয়ে দিলেন।

তাকে বললাম, মেয়েটি আপনার কি হয়? অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। ওই দক্ষিণ কর্নারের অস্থায়ী হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন?

বৃদ্ধা আমার দিকে চেয়ে ম্লান হাসলেন। বললেন, ডাক্তার দেখিয়ে কি হবে? ওর কচি মন আর শরীরের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা কে সারাতে পারবে? দেখুন, আমরা নিচু জাতের মানুষ। আসামের চা বাগানে কুলি কামিনের কাজ করি। বাগানের মালিক আগে জমিদার ছিলেন। রাজাবাবু নিজের জমিতেই চা বাগান করিয়েছেন। বছরের অনেকটা সময় শহর থেকে এসে রাজাবাবু বাগানের ভেতরেই দেয়াল ঘেরা বাড়িতে বাস করলেও কখনো আমাদের সঙ্গে মেশেন না। তারা উচু জাতের মানুষ, আমাদের ছায়া মাড়ালেও জাত চলে যায়। রাজাবাবুর বাসা–বাড়ির আশপাশে যাওয়া পর্যন্ত নিষেধ। নিতান্ত যেতে হলে জুতো খুলে, ছাতা গুটিয়ে আদব–কায়দা ঠিক রেখে যেতে হয়। এমনিতে রাজাবাবুর সাক্ষাৎ আমরা পেতাম না। শুধু নববর্ষের উৎসবের সময় তিনি বাগানের বড়বাবুদের নিয়ে আমাদের নাচ–গান দেখতে আসতেন।

গত নববর্ষে আমার মেয়ে কলাবতী পনেরোতে পড়লো। তা সে বেশ নাচ–গান শিখেছিল। উৎসবে ওর নাচ দেখে রাজাবাবু আমাদের সর্দারকে ডেকে বললেন, কলাবতীকে আমার বাংলোয় নিয়ে আসবি, কিছু অতিথি আসবে, আমি ওর নাচ ওদের দেখাতে চাই।

শুনে আমি বাপ মরা মেয়েটাকে ভাল করে সাজিয়ে–গুজিয়ে সর্দারের কাছে নিয়ে গেলাম। মেয়ে রাজাবাবুকে আর তার অতিথিদের নাচ দেখাবে এতো আনন্দের কথা। কিন্তু আসল বিষয় যে অন্য রকম তা জানবো কি করে? নাচ দেখার নামে মহলে নিয়ে কলাবতীকে রাজাবাবু এবং দারোগাবাবু মিলে রাতভর অত্যাচার করেছে।

সকালে সর্দার আধমরা মেয়েটাকে বাড়ি দিয়ে গেল। একতাড়া টাকা দিয়ে বলে গেল, এবারের নববর্ষে রাজাবাবু আর থানার বড়বাবুর ভোগে লেগেছে তোর কলাবতী। কাউকে বলে বিপদ বাড়াতে যাসনে যেন। আমি ওর চিকিৎসার জন্য কবরেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পরে জানলাম রাজাবাবু আর থানার বড় বাবুর পর ওই বদমাশ সর্দারটাও মেয়েটার ওপর অত্যাচার করতে ছাড়েনি।

সর্দারের কবিরাজ মলম লাগিয়ে ওর শরীরের ক্ষতগুলো সারিয়েছে বটে কিন্তু ওইটুকুন মেয়ের মনে যে ক্ষত হয়েছে তা আর সারলো না। চঞ্চলা মেয়ে আমার সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে কাদতো। পড়শিদের পরামর্শে ওর মন ভালো করতে নিয়ে এলাম কুম্ভ মেলায়। এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধা থামলেন।

বললাম, আপনি থানায় অভিযোগ করলেন না কেন? কলাবতীকে ধর্ষণের জন্য ওদের শাস্তি হওয়া দরকার।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই তাবুর ভেতর থেকে মেয়েটির গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসে।

বৃদ্ধার চোখ দুটি যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি গর্জে ওঠেন, অসহায় যুবতী মেয়েকে বাগে পেলে শিক্ষিত সভ্য পুরুষের মধ্যেও বিবেক থাকে না, জাত–পাতের বিবেচনাও থাকে না। রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যে নিচু জাতের হাটতে মানা সেই নিচু জাতের কন্যাকে কায়দা করে ভেতর বাড়ি নিয়ে অত্যাচার করলে বাবুদের জাত যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের বাড়িও অপবিত্র হয় না। আসলে লালসা কোনো মিনসের মধ্যে নেই? ভেতরে সবাই চেপে রাখে। তবে সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়তে দেরি করে না। পুরুষ চালিত এই সমাজে কে কার বিচার করবে?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হেনে বৃদ্ধা তার ক্রন্দনরত কন্যার উদ্দেশে প্রস্থান করলেন। বৃদ্ধার অগ্নিঝরা দৃষ্টি আর কটূক্তিতে ক্ষুব্ধ হলাম না। বুঝতে পারলাম তিনি আর তার কন্যা কলাবতী নিদারুণ মূল্য দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করেছে। পুরুষ হিসেবে নিজেকে বড় পাপী ঘৃণ্য মনে হতে লাগলো। পাপ বোধের অনুভূতি থেকেই রেহাই পেতে আমি আরেক দফা পুণ্য স্নানের জন্য তিন নদীর সঙ্গমস্থলের দিকে পা বাড়ালাম।

বরিশাল সদর থেকে

প্রেয়সীর টানে

আমার প্রিয়া কক্সবাজার টুরে যাচ্ছে শুনে স্থির থাকতে পারিনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলাম কক্সবাজার।
প্রথম দিন ফোনে যোগাযোগ করে দ্বিতীয় দিনে কাছাকাছি জায়গায় বেড়াতে গেলাম। এখানে বলে রাখি আমার ভালোবাসা একতরফা। সে তার কিছু বোঝে, হয়তো বা বোঝে না। তার কাছে আমার ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশে এই লেখা। সেই পাহাড় ঘেরা বন্য প্রাণীদের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে খুনসুটি করতে করতে ওই দিনের বেড়ানো শেষ করলাম।
সে আমার আত্মীয় হওয়ায় সবার সঙ্গে মিশতে আমার সুবিধা হলো। দ্বিতীয় দিন তাদের অনুরোধে এবং তার সম্মতিতে হোটেল ছেড়ে তাদের সঙ্গে উঠলাম। একই দিনে নাফ নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমরা সদলবলে বেরিয়ে এলাম। সেখানে ছবি উঠালাম এবং বিভিন্ন মিষ্টি আলাপে বেড়ানো হলো।
কিন্তু এর মাঝে আমার আফসোস হলো তাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের কাছে যাওয়া হলো না বলে। সেই সুযোগও আমার হলো তার পরের দিন সকালে। এতে মনে করি, আসার পথে গাড়িতে ফকিরের আশা পূর্ণের দোয়া হয়তো কাজে লেগেছে।
তার সঙ্গে সমুদ্রের পানিতে পা ভিজিয়ে হাটা এবং গোসল আমার ভালোবাসা সিক্ত তপ্ত মনকে প্রেমের অনাবিল প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে। তার সমুদ্রে ঢেউয়ের পানি ভীতি, প্রতিটি স্পর্শ আমার আন্দোলিত মনে ভালোবাসার গভীরে শিহরণ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে রিকশা ভ্রমণ ও সুইমিংয়ে আমার প্রেমকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলাম।
আমার প্রিয়া যার নামের প্রথম অক্ষর N, আমি এই লেখা দিয়ে তোমার প্রতি আমার দীর্ঘ দিনের ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাই। N, তুমি কি তার যথাযোগ্য সম্মান রাখবে?

নাম ঠিকানা বিহীন

শেষ দেখা

পর পর দুবার এইচএসসি-তে রেজাল্ট খারাপ করার পর স্থানীয় এক কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনায় বেশ মনোযোগ দিয়েছি। সন্ধ্যা সাতটা থেকে খাওয়া আর নামাজের সময় বাদ দিয়ে টানা রাত দুটো পর্যন্ত পড়া। আবার ভোর পাচটায় উঠে ফজরের নামাজ শেষে পড়তে বসা। দিনগুলো ভালোই নিয়ম মাফিক চলছিল।
সময়টা ছিল ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। এই মাসের চার পাচ তারিখে আপু-দুলাভাই এবং চার মাসের ছোট্ট ভাগ্নেকে ঢাকার বাসে বিদায় জানিয়ে কোচিংয়ে যখন ক্লাসে ঢুকলাম তখন ক্লাসের সময় প্রায় আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে।
ক্লাস-টিচার দেরির কারণ জানতে চাইলে তা বললাম।
ক্লাসে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ ক্লাসের প্রথম বেঞ্চের এক পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে প্রতিদিন আমি বসি সেখানটাতে দেখি দুটি মেয়ে পাশাপাশি বসে ক্লাস করছে। বুঝতে পারলাম নতুন আগন্তুক। তাই বাধ্য হয়েই শেষের বেঞ্চে বসলাম।
ওই দিন কোচিং শেষে বাসায় ফিরলাম। পরদিন ক্লাস শুরু হওয়ার প্রায় পনেরো বিশ মিনিট আগেই গেলাম। ওই দিন দেখি দুইজনের মধ্য থেকে একজন এসেছে। কোচিংয়ের অপর এক বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, তোমাদের আরেকজন সঙ্গী কোথায়?
বান্ধবী জবাবে জানালো, যাতায়াতের সমস্যার কারণে ওই মেয়েটি আসবে না। যদিও নতুন আগন্তুক দুজন এবং ওই বান্ধবী তিনজনের বাসাই কাছাকাছি ছিল।

যাহোক, এরপর নতুন আগন্তুকের সঙ্গে পরিচয় হলো, কথা হলো। মেয়েটি বোরখা পরতো।
দুই তিন দিন পর হঠাৎ দেখলাম মেয়েটি প্রচণ্ড গরমের কারণে বোরখার উপরের অংশটি খুলে ক্লাস করছে। পেছন থেকে বেশ সুন্দর লাগছিল। তাই সম্পূর্ণ চেহারাটি দেখার জন্য বেশ আগ্রহ বোধ করছিলাম।
পাশে বসে থাকা বন্ধুকে কথাটা জানাতেই সে ওকে ডাকলো।
পেছন ফিরে তাকাতেই আরো বেশি অবাক হয়ে গেলাম। এতো সুন্দর একটি মেয়ে প্রায় সপ্তাহ খানেক যাবৎ আমার সামনে বসে ক্লাস করছে, অথচ আমি জানি না।
যাহোক, এরপর থেকে তার সঙ্গে বেশ আগ্রহ নিয়েই কথা বলা শুরু করলাম। মনে মনে জন্ম নিল ভালোবাসার।
এরপর এলো ১৪ ফেব্রুয়ারি। আমার ক্লাসের সবাই মিলে বেশ মজা করলাম, গান গাইলাম। ও আসার সময় রজনীগন্ধার স্টিক কিনে এনেছিল। যাওয়ার সময় সবাইকে একটি করে ফুল দিল। আমাকেও দিল।
দিন যতো গড়াতে লাগলো, ওর প্রতি ততো দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম।
এটি ছিল মার্চ মাসের ১১ তারিখ। আমার বোন ঢাকা থেকে ফিরে আসায় কোচিংয়ের সব বন্ধুরা আমার ভাগ্নেকে দেখার জন্য বাসায় আসতে চাইলো। এবং সবাই বাসায় এলো ও দুপুরে একত্রে খাওয়া– দাওয়া করলো। এর মধ্যে আমি শুধু বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছি এবং সেও বার বার তাকাচ্ছে। প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, ও আমাকে ভালোবাসে।
একদিন কোচিংয়ে যাওয়ার পর ও বললো, তোমাদের বাসার সবাইকে আমার বেশ আপন মনে হলো।
তখন আমার খুশি দেখে কে?
ওই দিন কোচিং থেকে একটি নোট দিল। নোটটি সবাইকে ফটোকপি করে দেবো বলে বললাম। সবার জন্য নোট ফটোকপি করলাম। একটি কপির শেষের পাতায় কোণায় খিলাম ILY এবং সেই কপিটি আমি ওকে দিলাম।
এরপর অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর উত্তরের জন্য।
ক্লাস শেষে ও আমাকে ডাকলো।
আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। বাইরে গেলাম।
ও ব্যাগ থেকে কি যেন বের করছে।
ভাবলাম, নিশ্চয়ই ও আগে থেকেই আমার জন্য চিঠি লিখে রেখেছে সেটা এখন দেবে।
কিন্তু ও ব্যাগ থেকে বের করলো ওই নোটটি। ILY (I Love You) লেখাটি দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এটি কে লিখেছে?
বললাম, কেন? আমিই লিখেছি।
প্রতিউত্তরে সে বললো, খুব কষ্ট পেলাম।
তার এই কথা শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কোনো হিসাব মেলাতে পারলাম না।
যাহোক, ভাঙা মন নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম। রাতে অনেক্ষণ কান্না করলাম। এরপর মনে হলো আমার এই হাত দিয়ে তিনটি অক্ষর লেখার কারণে সে কষ্ট পেয়েছে। এই হাতকেও কষ্ট দেবো। তাই কয়েলের আগুন দিয়ে ডান হাতের প্রতিটি আঙুলের মাথা পোড়ালাম। প্রতিটি আঙুলের মাথায় বড় বড় ফোসকা পড়ে গেল।
পরদিন কোচিংয়ে গিয়ে একদম পেছনের বেঞ্চে বসলাম।
ক্লাস–টিচার মন খারাপ করে পেছনে বসার এবং অন্যভাবে কলম ধরতে দেখে কি সমস্যা হয়েছে তা জানতে চাইলেন। শুধু বললাম, কোনো সমস্যা নেই, আমার কিচ্ছু হয়নি।

এরপর আর ওর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। তার ঠিক দুইদিন পর অর্থাৎ ১৫ মার্চ ও আমাকে অবাক করে দিয়ে কোচিং শেষে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাস করলো, আমার মাথায় এই চিন্তা কবে থেকে ঢুকেছে।

বললাম, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি ওই দিন থেকে।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কিছু বলবে?

ও বললো, না।

বাসায় চলে এলাম, এবং কিছুক্ষণ পর একটি বিশেষ কাজে আবার বাইরে এলাম। কাজ শেষে বাসায় ফিরে দেখি ও আর সেই বান্ধবীটি বাসায় বসে আছে।

ঘরে ঢোকার পর বললো, সাজেশনের জন্য এসেছে।

আসলে কিসের সাজেশন সেটা নিশ্চয় বুঝতেই পারছেন।

ওই দিন থেকে ও আমার হলো।

ওকে বললাম, আমার জন্য ছয় বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ও রাজি হলো। বললো, ওর বাবা দেশের বাইরে থাকে ফিরতে চার পাচ বছর দেরি হবে। আর ওর বাবা না আসা পর্যন্ত বিয়ে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং ওর কোনো সমস্যা নেই।

এভাবেই কাটতে লাগলো আমাদের স্বপ্নময় দিনগুলো। এরপর পরীক্ষা এলো। আমি মাত্র তিন–চার নাম্বারের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পেলাম না। কিন্তু ও পাস করতে পারলো না।

ওকে সাহস দিলাম, এটা কোনো ব্যাপার না। তুমি আবার ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে পাস করবে। কিন্তু পরের বারও পরীক্ষায় সে খারাপ করলো। ইতিমধ্যে তার বাবা হঠাৎ দেশে চলে এলেন এবং মেয়ের বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন।

সে আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলো এখন আমাদের কি করণীয়?

জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের কি পালিয়ে বিয়ে করা সম্ভব?

সে বললো, না।

তাহলে আমাদের আর দেখা না হওয়াটাই উচিত।

সে আমার সঙ্গে একমত হলো।

এই কথাগুলো হচ্ছিল আমাদের কলেজের (সাদত কলেজের) পুকুরপাড়ে বসে। এরপর আমরা বাসে চড়ে বাসস্ট্যান্ডে এলাম।

বাসস্ট্যান্ডে নেমে ও বললো, এসো, কিছু খাই।

বললাম, না।

আজকেই তো শেষ দেখা।

আর তো দেখা হবে না। চলো না।

বললাম, ইচ্ছে করছে না।

ওকে রিকশায় উঠিয়ে দিয়ে আমিও একটা রিকশা নিলাম। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। সেই তো শেষ দেখা!

এরপর ও ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করেছে যোগাযোগ করার জন্য। কিন্তু কষ্টের দাবানলটাকে আর ছড়াতে চাইনি।

বছর খানেক আগে ওর বিয়ে হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, *টাঙ্গাইল থেকে*

একাল ওকাল

– ডা. আসিফ রহিম

ভূমিকা : প্রেম ভালোবাসা শাশ্বত। পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এর নিরবিচ্ছিন্ন ক্রমাগত চক্রবৃদ্ধিহারে এর ব্যাপ্তি তারই প্রমাণ। কিন্তু মহাকালের এ স্রোতে বিবর্তনের ধারায় প্রেম ভালোবাসাও হয়েছে বিবর্তিত। তাই আজ লাইলী–মজনু, রোজ–জ্যাকের, শিরি ফরহাদের প্রেম, টাইটানিক প্রেম, ভালোবাসার শাশ্বত নিঃস্বার্থ রূপ, ধারণা, আবেগ, মন কনভার্ট হয়েছে দেহকেন্দ্রিক শারীরিক যৌনতায়।

ভালোবাসার সংজ্ঞা : হৃদয়ের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মনের বিস্তৃত আঙ্গিনায় যদি বিপরীত লিঙ্গের কারো জন্য হঠাৎ করে উথাল–পাতাল মহাসগরে রূপান্তর হয় তাহলে তাকে সাধারণভাবে প্রেম বা ভালোবাসা বলা হয়। যদিও প্রেমের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা গণ্ডি দেয়া দর্বোধ্য। আজকের যুগে এই সংজ্ঞাও অচল। বরং বলা চলে, একাধিক সুন্দর ফুলের মধু আহরণের উদ্দেশ্যে মাতাল ভ্রমণের স্বার্থযুক্ত নির্বিচার পদচারণা অথবা একাধিক হ্যান্ডসাম ভ্রমরকে কুপোকাত করার জন্য সুন্দরী ফুলদের অহংকারী প্রতিযোগিতাকেই প্রেম বলে।

প্রকার : এক. প্রথম দর্শনে প্রেম *দুই.* চিঠির মাধ্যমে প্রেম *তিন.* প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল, অফিস প্রেম। *চার.* ফোনের মাধ্যমে প্রেম, মিস কল জনিত অধুনা সংস্করণও এর অন্তর্গত *পাচ.* প্রেম ইমেইল ইন্টারনেট চ্যাট। *ছয়.* প্রবীণ প্রেম : এরশাদ–বিদিশা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আসলে ছয়টি প্রকার থাকলেও ভালোবাসার প্রকার বলে শেষ করা যাবে না। নিত্য নতুন হওয়ার সংস্করণ প্রতিনিয়ত যুক্ত হয়ে একে জটিলতর করে তুলছে।

লক্ষণ : হঠাৎ করে কেউ যদি এদিক–সেদিন ঘন ঘন চাওয়াচাওয়ি করে, লেডিস হস্টেল,কলেজের সামনে সন্দেহজনক পদচারণ, দার্শনিকভাব বা হঠাৎ কথাবার্তা কমে যাওয়া, ক্ষিধে মন্দা, মানিব্যাগের পুষ্টিহীনতা, জুতার তলা ক্ষয়, বুক ধরফড় করা, অস্থির, মনমরা ভাব, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকানো, টেলিফোন সেটের আশপাশে বা কম্পিউটারের নেটে ঘন ঘন বিচরণ করা, ঘন ঘন মোবাইল ফোনে তাকানো, মিসকল দেয়া ইত্যাদি। এছাড়া কেউ যদি কিছু না বলে দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘ দিন নিরুদ্দেশ থাকে, কারো পকেটে সিগারেট, মানিব্যাগের সাথে কনডম পাওয়া, অনেক সময় মেয়েদের পার্সে টাকার পাশাপাশি পিল বা কনডম পেলেও অবাক হবার কিছু নাই। এক্ষেত্রে অনেক মেয়েই সিমেনযুক্ত কনডম সংরক্ষণ করে প্রথম মিলনের স্মৃতি অম্লানের জন্য।

ডায়াগনসিস : উপরোক্ত মানিব্যাগ সার্চ ছাড়াও পকেটে *এক.* প্রেমিক প্রেমিকার ছবি *দুই.* মেয়েদের ঠোট ফুলে কলা গাছ হওয়া *তিন.* গালে রক্ত জমাট চাকা (ফর্শা মেয়েদের) *চার.* ছেলেদের শার্টে লিপস্টিকযুক্ত ঠোটের ছাপ *পাচ.* শরীরের বিভিন্ন অংশে আচড়ের দাগ *ছয়.* এছাড়া প্রপার এক্সপেরিয়েন্স করে মেডিকাল টেস্ট করলে মেয়েদের স্তনে কামড়ের দাগ ফোলা ভাব যৌনাঙ্গের সতীচ্ছদ ছেড়া বা কাপড়ে বীর্যের অস্তিত্ব ইত্যাদি আধুনিক প্রেমের লক্ষণ। *সাত.* অধুনা DNA বা প্যাটারনিটি টেস্ট করে প্রেমিক শনাক্ত করা সম্ভব। অচিরেই আমাদের দেশে এটির প্রচলন হতে যাচ্ছে।

চিকিৎসা : মেডিকাল চিকিৎসায় দ্রুত উভয় পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও বিয়ের ব্যবস্থা–এ পদ্ধতিতে অনেক রিস্ক থাকলেও একটি সর্বোত্তম – কারণ কাবিন ছাড়া ভালোবাসা কখনো স্থায়ী হয় না ও মেয়েরা বিয়ে ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ছেলেদের স্যাকৃফাইস বোঝে না।

শল্য চিকিৎসা : অসম, পরকীয়া ও অবৈধ প্রেমের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি দরকার। *এক.* উভয় পক্ষের সম্মতিতে দ্রুত কাটআপ–এর ব্যবস্থা। *দুই.* এমআর, ডিঅ্যান্ডসি, অ্যাবরশন করা। *তিন.* অতি সত্বর আক্রান্ত প্রেমিক প্রেমিকাকে অন্যত্র বিয়ে দান করা। তবে শল্য চিকিৎসার আগে ও পরে ছ্যাকামাইসিন রেডিও থেরাপির মতোই কার্যকরী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এক. পালিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করা। এটি প্রকৃত প্রেমের দৃষ্টান্ত। তাই একে সবার শ্রদ্ধা ও সামাজিক সাপোর্ট করা উচিত। দুই দেবদাস বা বদ্ধ উম্মাদ হওয়া–এ সমস্ত ক্ষেত্রে আগে থেকেই সাধারণ হয়ে মেডিকেল পদ্ধতি নেয়া আবশ্যক। *তিন.* বাংলা সিনেমার নায়ক হওয়া–মদ্যপান ও সন্ত্রাস করা। এক্ষেত্রে প্রেমিকাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন একান্ত কর্তব্য। *চার.* আত্মহত্যা বা নিজেকে ধ্বংস করা এক্ষেত্রে কাপুরুষতার নামান্তর। তবে সহমরণকে বীর উত্তমের মতো চিরশ্রদ্ধা করে স্মৃতিসৌধ তৈরি করা সামাজিক দায়িত্ব *পাচ.* প্রেমিকার উপর প্রতিশোধ, খুন করা বা এসিড মারা কিংবা ধর্ষণ করা। এ ব্যাপারে কোনো ছেলেকে আগে মেয়েদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এ প্রতিক্রিয়া রোধ করা আমাদের সামাজিক সম্মিলিত কর্তব্য।

ভালোবাসার সাবধানতা : বিয়ের আগে কখনো কোনো মেয়েকে কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাস করবেন না। প্রয়োজনে আদম হাওয়ার ঘটনা বিস্তারিত জানুন।

কখনো কোনো ছেলের মিষ্টি কথায় হুট করে তাকে বিশ্বাস করবেন না। ছেলেরা মেয়েদেরকে অনেক সময় প্রতারণা করে। তাই আপনার প্রেমিককে ভালোভাবে জেনে মন দেবেন। গভীর প্রকৃত প্রেমে যদি শারীরিক মিলন হয়েই যায় তাহলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বাচ্চাটি নিয়ে নেবেন। কারণ জীবনের প্রথমে এমআর করালে সারা জীবনে হয়তো আপনি আবার মা নাও হতে পারেন।

পরিশেষে ভালোবাসা দিবসে সকল প্রেমিক–প্রেমিকা, স্বামী–স্ত্রীকে হ্যাপী ভ্যালেনটাইনস শুভেচ্ছা।

ঢাকা থেকে

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি

– মোহাম্মদ আবুল কায়েস

সময়টা ২০০১ হবে। আমি লন্ডন শহরতলির একটি ছোট শহর লুটন–এ থাকি। নতুন এসেছি বছর খানেক হবে। দেশে এমসি কলেজে মাস্টার্স ও ল কলেজে পার্ট ওয়ান কমপ্লিট করার পরও ইংরেজিতে ততোটা স্মার্ট ছিলাম না। অথচ লুটন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই। তাই বিশেষত ইংরেজিটা ঠিক করার উদ্দেশ্যে আমার ভাইয়ের ঘরের পাশেই একটি স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র লি ম্যানর কমিউনিটি কলেজ (Lea Manor Community College) এ ভর্তি হই। *লি ম্যানর*–এ প্রতি সোমবার ও বুধবার এ দুই দিন দুঘন্টা করে চার ঘণ্টা সপ্তাহে ক্লাস হতো।

সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে আরম্ভ হয়ে পরের জুন পর্যন্ত ক্লাস চলে। ইংরেজি শেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে পূর্ব ইওরোপের দেশ থেকে এসব স্থানীয় কলেজে ছেলেমেয়েরা আসে। এমনকি এখানকার পারমানেন্ট রেসিডেন্টরা যায় বিভিন্ন দেশের, তারাও ইংরেজি শেখার জন্য সরকারি সুবিধায় এসব স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়তে পারে। আরেকটি কথা, ছোট– বড় সবাই পড়তে পারে। এখানে বয়স কোনো ব্যাপারই না। ষোল বছর থেকে ষাট হলেও অসুবিধা নেই।

এসব কোর্স বেশির ভাগ ফ্রি বা একেবারে সামান্য ফি–এর বিনিময়ে ইওরোপিয়ানের জন্য। সরকারি ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে তা খরচ করা হয়। স্থায়ী বসবাসকারীরা সরকারি সাহায্যে লেখাপড়া করে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে মনে হয় এই দেশে।

আমার ইংরেজি শেখার প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হয়ে দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বয়স্ক কয়েকজনও আছেন।

আমাদের কোর্সের নাম English For Speakers of Other Languages-সংক্ষেপে ইএসওএল (ESOL)।

কয়েকজন টিচারের মধ্যে দুজন ছিলেন আমাদের ক্লাসের কমন। তার মধ্যে ইনডিয়ান নারী টিচার রিনা পিন্টু সবচেয়ে বেশি আমোদপ্রিয় ও খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। মজা করতেন আমাদের সঙ্গে। কখন যে ক্লাসের সময় শেষ হয়ে যেতো তা খেয়ালই থাকতো না।

প্রথম দিনে সকলের পরিচয়ের পালা। নাম, কোথা থেকে আসা, এই শহরের কোথায় থাকা হয় ইত্যাদি। প্রায়জনই এসেছেন ইংরেজি শিখে ছয় মাস বা এক বছর পরে তাদের দেশে ফিরে যাবেন এই লক্ষ্যে। এদের এন্ট্ ক্লিয়ারেন্স বা ভিসা আছে। কেউ অপেয়ার হিসেবে আছেন। অপেয়ার একটি ফ্রেঞ্চ শব্দ। এর মানে হচ্ছে তারা এখানে এসে কোন বাসায় থাকবে তা আমার আগে ঠিক করে আসবে। এবং ওই বাসার ছেলেমেয়েদের স্কুলে নেয়া–আনা করবে, তাদের দেখাশোনা করবে। বিনিময়ে থাকা–খাওয়া ফৃ। অর্থাৎ আমাদের লজিং মাস্টারের মতো। কোর্স শেষ হলে যে যার যার দেশে ফিরে চলে যাবে।

এরই মধ্যে ক্লাসের সকলের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেল এবং দিন দিন ইংরেজিতে উন্নতি হচ্ছে দেখা গেল, বিশেষ করে রিনা পিন্টুর একান্ত চেষ্টায়। মাঝে মধ্যে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হতো আমাদের সকলকে। কারণ একই শব্দের বিভিন্ন দেশীয় উচ্চারণে হাসির রোল পড়তো।

এখানে আমি, শামীম নামের আরেকজন বাঙালি। ইরানের স্বামী–স্ত্রী দুজন তাহেরা ও জাহির, টার্কির সিবিয়া বালতুজি, জুখাই। আর্জেন্টিনার জুলিয়ানা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের লুরা গ্রাবৃয়েলা। ভিয়েতনামের চাও। চায়নার চ্যাং। বুলগারিয়ার লারা, জিম্বাবুয়ের কৃষ্ণাঙ্গ লিলিয়ান। চোকাস্লোভাকিয়ার ডগমা ও ক্লারাসহ অনেকে।

সকলের সাথে মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছিল।

মার্টিনির আফৃকান কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে সদ্য যৌবনা লুরা। এ কালো, লম্বা, অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটিকে প্রায়ই আমি মিস মার্টিনি বলে ক্ষ্যাপাতাম। মায়াভরা এ কালো মেয়েটিই ছিল ক্লাসের প্রাণ। তার নজরকাড়া চোখ দুটি দেখলেই যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কথা মনে পড়ে যেত, *কালো সে যতো কালোই হোক, কেউ দেখে না তার হরিণ কালো চোখ*। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এরই মতো চোখ দেখে এ কবিতা লিখেছিলেন। সর্বদা হাসি–খুশি–প্রাণবন্ত লুরা–কে দেখলে একটা ভালো লাগার অনুভূতি কাজ করতো।

ধীরে ধীরে মেয়েটি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করতে লাগলো।

প্রতি ক্লাসের আগে বা পরে ওর সঙ্গে কথা না বলরে যেন আমার ক্লাসই করা হতো না। তাকে বলতাম, আমার প্রিয় কৃকেটার ব্যাটসম্যান *ব্রায়ান লারা*–র দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাই সেই দেশের মানুষদের আমার ভালো লাগে। তোমাকেও তাই।

শুনে সে খুশিতে আটখানা হতো।

সে খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চাইতো আমাকে। আমিও তাকে। শুধু একজন ভালো বন্ধু হিসেবে।

আমাদের এই সম্পর্ক কারো চোখ এড়ায়নি। পঞ্চাশ উর্ধ বয়সের ইরানি তাহেরা ও জহির আমাদের নিয়ে মজা করতেন। এবং প্রতি ক্লাসে আমি বা লুরা আগে এলে একজনে পাশের চেয়ারটা রেখে দিতেন আমার জন্য কিংবা লুরার জন্য।

লুটনের সামারে যে কার্নিভাল হতো সেটা আফৃকানদের এক বিরাট মিলন মেলা ছিল। সম্ভবত তা ছিল সারা বৃটেনের তৃতীয় বৃহত্তম মেলা বা কার্নিভাল। সেখানে আমি ও লুরা যেতাম। পাশাপাশি কালোদের সঙ্গে শাদা ও এশিয়ানরা সমবেত হতো সেই মেলায়। ড্রাম আর মিউজিকের তালে তালে আমরা সবাই হারিয়ে যেতাম। সেই আনন্দ দিনগুলোর কথা ভোলার নয়। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক লেন–দেন আমার জন্য ছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

লুরা গ্যাবৃয়েল সে তার দেশের একজন স্কুল টিচার। কম্পিউটারে তার দখল অসাধারণ। ক্লাসের ফাকে লাইব্রেরিতে সব সময় কম্পিউটারে ডুবে থাকতো। আর তার সঙ্গী আমি। আমাদের কথা চলতো অনবরত।

কথাচ্ছলে সে তার বয়ফ্রেন্ডের কথা বলেছিল। তার কোর্স শেষে ফিরে গেলে বিয়ে হবে। ইন্টারনেটে ফোনে প্রতি সপ্তাহে আলাপ করতো।

কৃসমাসের লম্বা বন্ধ থাকায় আগেই কৃসমাসের পার্টি হয়ে গেল আমাদের কলেজে। এটাই এখানকার ট্রাডিশন। সম্ভবত ষোল সতেরো ডিসেম্বরের পার্টি ছিল।

কৃসমাস উপহার নিয়ে সে এক দারুণ কাণ্ড। লুটনে এশিয়ান কম্পিউটার থাকার সুবাদে লুরা দেখেছিল শাড়ি পড়া বাঙালি নারীদের। তারা প্রচণ্ড আগ্রহ শাড়ি কিভাবে পরে এবং কেমন লাগে ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নবান, কেনই বা পরে? তাই সিদ্ধান্ত নিলাম কৃসমাস উপহার হিসেবে শাড়িই হবে লুরার উপযুক্ত উপহার।

শাড়ি পেয়ে তার সে কি আনন্দ! সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহপাঠীদের আগ্রহে শাড়ি পরানোর দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তালো। পাশের ক্লোকরুমে আমি ও লুরা। অর্ধ অনাবৃত লুরাকে দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আফৃকান কালোদের রূপযৌবন। *কৃষ্ণ কলি আমি তারেই বলি!* অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ হাতে শাড়ি পরিয়ে দিতে গিয়ে তার দেহের স্পর্শে শিহরিত হয়েছি। রোমাঞ্চ অনুভব করেছি।

বেরিয়ে এসে আমাদের গ্রুপ ছবি তোলার পালা। আমার ও শাড়ি পরা লুরার ছবি। তাকে বাঙালি ললনা মনে হচ্ছিল।

স্মৃতি স্বরূপ আমার অ্যালবামে লুরার সেই ছবি দেখে এখনো মাঝে মধ্যে আনমনা হয়ে যাই।

দেখতে দেখতে আমাদের কোর্সের শেষ পর্যায়ে চলে। জুনের শেষ সপ্তাহে আমরা যে যার মতো চলে যাবো। সকলের মাঝ একটা বিমর্ষ ভাব চলে আসলো। আসলে আমরা সবাই সবাইকে হারাতে যাচ্ছি। আমরা যে একে অপরের ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম তা টেরই পাইনি।

জুলিয়ানরা চলে যাবে আর্জেন্টিনায়, ক্লারা ও ডগমা চলে যাবে চোকাস্লোভাকিয়া। সাবেক (চেক রিপাবলিক) জুখাই, সিবিয়াবানতুসি, জুমিরহা টার্কিতে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজে লুরা যে হয়েছিল আমার প্রিয় বান্ধবী। তাহেরা, ও জহির ইরানে, যার যার দেশে চলে যাবে। সকলের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব মনে থাকবে আজীবন। হয়তো আর কোনোদিনই কারো সঙ্গে কারো দেখা হবে না।

আবেগ ভরা কণ্ঠে সবাইকে বলেছিলাম, যাবো ইস্তাম্বুলে, যাবো বুয়েনস এয়ার্সে, যাবো চেক রিপাবলিকে। জীবনের কঠিন বাস্তবতায় হয়তো কোনোদিন যাওয়া হবে না কোথাও। কোনো দিনই শুনতে পারবো না *লুরার* মুখের আধো-ভাঙা উচ্চারণে, *কোয়েস, আই লাইক ইউ ভেরি মাচ। কোয়েস ইউ আর এলিগান্ট।*

মনে থাকবে বিদায় দিনের শেষ বেলায় লুরার কান্না। লুকিয়ে কয়েক ফোটা চোখের জল ফেলা। আমিও আবেগ লুকিয়ে বলেছিলাম, ভালো থেকো, তোমার ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে। সুখী হও জীবনে।

আজ ফেব্রুয়ারির এই ভালোবাসা দিবসে লুরার প্রতি রইলো গভীর ভালোবাসা। ডিসেম্বরে লন্ডনের লি ম্যানর স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে লুরার কথা খুবই মনে পড়ে। লুরা কি সত্যই তার ভালোবাসার মানুষকে পেয়েছে? যার সঙ্গে ঘর করার স্বপ্ন নিয়ে সে লুটন ছেড়েছে কয়েক বছর আগে?

লুটন, ইংল্যান্ড থেকে

অভিমানী

– মোতাহার হোসেন সোহেল

মাত্র একুশ বছর বয়সে মা এবং মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছি এই প্রবাসে। এরপর কেটেছে আরো দুই বছর। ভালোবাসি কথাটা তখনো কাউকে বলা হয়নি।

কাজ করি কোরিয়ার একটা ছোট কম্পানিতে। মোট বারোজন শ্রমিক। দুইজন ফিলিপিনো, তিনজন রাশিয়ান এবং আমরা দুজন বাংলাদেশি। বাকি পাচজন কোরিয়ান।

গত বছরের মাঝামাঝিতে পরিচয় হলো নাতাশার সঙ্গে। রাশিয়ান মেয়ে। বয়স তেইশ। নতুন কাজে এসেছে আমাদের কম্পানিতে। নাতাশা অপূর্ব সুন্দরী, তার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি তার মতো সুন্দরী মেয়ে আমার চোখে পড়েনি।

আস্তে আস্তে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি।

সারা দিন ইশারাতে কাজ করি এক সঙ্গে। আর তাকিয়ে থাকি তার সুন্দর মুখটার দিকে। তার দিকে তাকাতে গিয়ে কতোবার যে কাজে ভুল করেছি সেটা আমিও জানি না। কিন্তু কথা বলতে পারি না। কারণ সে কোরিয়ায় নতুন এসেছে, না জানে কোরিয়ান ভাষা, না জানে ইংলিশ।

এভাবে কাটলো ছয় মাস, এখন সে কোরিয়ান ভাষা মোটামুটি বলতে পারে।

এ বছর জানুয়ারির পাচ তারিখ বললাম, নাতাশা, আজ আমার জন্মদিন। বাড়িতে থাকলে আব্বা আম্মাসহ সবাই কতো আনন্দ করতাম। আজ আমি একা, তুমি কি একটু সঙ্গ দেবে আমার সঙ্গে? আজ রাতের খাবার দুজনে এক সঙ্গে খাবো।

সে রাজি হলো।

প্রথমে গেলাম একটা বারে। সেখানে বসে দুজনে বিয়ার খেলাম এবং তাকে বললাম আমার ভালো লাগা, ভালোবাসার কথা।

সেও বললো, আমাকে তার ভালো লাগে।

এরপর গেলাম নাইট ক্লাবে। সেখানে বাজনার তালে তালে দুজনে প্রচুর নাচলাম। আর বাকি রাতটুকু কাটালাম হোটেলের এক বিছানায়।

সেই রাত হলো আমার প্রথম প্রেমের বাসর রাত।

এরপর থেকে আমরা একই রুমে থাকতাম। সুন্দরভাবে কাটছিল আমাদের অবিবাহিত সংসার। একদিন আরো সুন্দর একটা খবর পেলাম। তার গর্ভে আমার সন্তান। আমি তো খুশিতে আত্মহারা। এতো তাড়াতাড়ি বাবা হবো ভাবতেও পারিনি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছিলাম তার সারা শরীর। আর বলেছিলাম, বিয়ে করে তোমাকে বাংলাদেশ নিয়ে যাবো।

কিন্তু সমস্ত স্বপ্ন এলোমেলো হয়ে গেছে আমার ছোট একটা ভুলের কারণে। গত মাসের প্রথম শনিবার একটানা চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করে রুমে আসছি রবিবার সকালে। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। রুমে এসে দেখি নাতাশা পরীর মতো সেজেগুজে বসে আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার বান্ধবীর বাসায় যাবার জন্য।

একটু ধমকের সুরে বলেছিলাম, যেতে পারবো না এখন ঘুমোবো।

সে বললো তুমি বিকাল পাচটায় ওখানে যাবে। এরপর এক সঙ্গে পার্কে যাবো। আর তুমি না এলে আমিও রুমে ফিরে আসবো না।

বললাম, ঠিক আছে, আমি যাবো।

মোবাইলে বিকাল চারটায় এলার্ম দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না। অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আর কখন যে চারটা পাচটা ছয়টা বেজে গেছে কিছুই জানি না। ঘুম ভেঙে দেখি রাত আটটা। মনে পড়ে গেছে নাতাশার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তার মোবাইলে ফোন করি। কিন্তু তার মোবাইল বন্ধ।

আস্তে আস্তে রাত গভীর হচ্ছে। দুশ্চিন্তা বাড়ছে। মোবাইলে বার বার ট্রাই করছি কিন্তু উত্তর একটাই, বন্ধ আছে।

সকালে কাজে গেলাম।

মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, নাতাশা কোথায়?

বললাম, গতকাল বন্ধুর বাসায় গেছে, এখনো ফেরেনি।

আজকেও ফিরলো না।

পরদিন মালিককে বললাম, কোনো খবর নেই।

তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো কোথায় থাকলো মেয়েটা।

মালিক উত্তর দিল, ভালো বেতনে হয়তো অন্য কোথাও কাজে লেগে গেছে।

বললাম, এটা হতে পারে না।

এরপর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটলো পুরো পচিশ দিন। ছাব্বিশ নভেম্বর সকালবেলা ফোন বেজে উঠলো দেখি সেই পরিচিত নাম্বার। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো।

কিন্তু ওপাশ থেকে কথা বলছে তার বান্ধবী। নাতাশা পুচ্ছোন সদর হাসপাতালে একুশ নাম্বার রুমে। আজ রাত দশটায় তার ফ্লাইট। সে রাশিয়া চলে যাবে।

কাজ বাদ দিয়ে ছুটলাম হাসপাতাল। কিন্তু তার সামনে দাড়িয়ে তাকে চিনতে আমারই কষ্ট হচ্ছিল। ছাব্বিশ দিন আগের নাতাশার সঙ্গে এই নাতাশার কোনো মিল নেই। একটা পা হাটুর নিচ থেকে কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। এক হাত প্লাস্টার করা।

আমাকে দেখার পর চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো চলে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। তুমি কথা রাখোনি। তোমার জন্য আজ আমি পঙ্গু।

তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি। কিন্তু সে কোনো কথা শোনেনি। বার বার তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি, সে ফিরেও তাকায়নি। তার সঙ্গে এয়ারপোর্টে পর্যন্ত গিয়েছি সে একটি কথাও বলেনি। এয়ারপোর্টে শ শ মানুষের সামনে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছিলাম আর বলেছিলাম, আমাদের সন্তানকে পৃথিবীতে আসতে দিও।

পরে তার বান্ধবীর কাছে সব কথা শুনলাম। আমার প্রতি অভিমান করে মদ খেয়ে রাস্তা দিয়ে হাটছিল। একটা গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। পরে পুলিশ তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

আজ নাতাশা আমার পাশে নেই। কিন্তু রেখে গেছে অসংখ্য স্মৃতি। সেই স্মৃতি নিয়েই কাটছে আমার প্রতিটা নির্ঘুম রাত।

পুচ্ছোন, কোরিয়া থেকে

মা

- নিজাম আহমেদ

আমার মা খুব ধার্মিক ছিলেন। আমাদের তিন ভাইকে ছোট অবস্থা থেকে সব সময় নামাজের তাগিদ দিতেন। আমার মায়ের বড্ড স্বপ্ন ছিল তার এক ছেলেকে বড় আলেম বানানোর। মায়ের সেই মহৎ স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। বড় ধরনের মওলানা বা আলেম না হলেও আমার দুই ভাই (বড় এবং ছোটজন) তবলীগ জামায়াতের অনুসারী হয়ে আজ স্ব স্ব ক্ষেত্র সুনাম অর্জন করেছেন।

আমার ভাইয়েরা যখন লম্বা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বাড়ি আসতেন তখন আমার আম্মা কি যে খুশি হতেন তা আম্মার চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তারপর শুরু হতো দোয়া–দরুদ এবং দ্বীন ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা। এই আলোচনা শুধু আমাদের পরিবারের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না, আশপাশের বাড়ির বৌ–ঝিরাও আসতো দ্বীনের শিক্ষা তথা তালিম নিতে। বছরের বিশেষ রাতগুলো যেমন শবেবরাত এবং শবেকদরের রাতে পাড়ার মহিলারা এসে আমার আম্মার কাছ থেকে রাতের ইবাদত ও নামাজের নিয়ম–কানুন জেনে নিতেন। এতে আম্মা পরম তৃপ্তি পেতেন।

আমি ছিলাম একটু ডানপিটে ধরনের। কলেজ ছাড়ার পর বাড়িতে বেশ কিছু দিন বেকার ছিলাম। পকেট খরচের জন্য সব সময় আম্মাকে জ্বালাতন করতাম। আমার আবদার মেটানোর জন্য আম্মাকে কতোদিন গালমন্দ খেতে হয়েছে আমার মেজাজি আব্বার কাছ থেকে তার হিসাব নেই।

তখন বাজারে ধানকলে ধান নিয়ে যেতাম চাল বানানোর জন্য। পকেট খরচের জন্য কল থেকে দুই তিন কেজি চাল এদিক–সেদিক করে পাশের বাড়ির রবিমামার দোকানে বিক্রি করতাম। বাড়িতে এলে আমার হামবড়া ভাব দেখলে আম্মা অনায়াসে বুঝে নিতেন নিশ্চয় আজ চাল পাচার হয়েছে।

একদিন তো ধরাই খেলাম। কল থেকে কুড়োসহ চাল এনে দিলে তৎক্ষণাৎ সাফসুতোর করে মেপে দেখলেন চাল আড়াই কেজি কম। তখন কি যে বকুনি দিলেন তা বলে শেষ করা যাবে না। আম্মার এমন ধরপাকড়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আম্মার মাপা ধানের মাঝে কখনো কখনো গোপনে তিন চার কেজি ধান বেশি করে ঢেলে রাখতাম যাতে এদিক–সেদিকটা ধরা না পড়ি।

একদিন ফলাফল উল্টো হয়ে গেল। কল থেকে চাল আনার পর আম্মা মেপে দেখলেন আজ দুই কেজি চাল বেশি হয়ে গেছে।

আম্মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বললাম, *কলে মনে হয় হেরফের হয়েছে। মিস্ত্রির ভুলের দরুণ হয়তো অন্যের চাল সামান্য এসে গেছে।* আসল কথা হচ্ছে, সেদিন চাল এদিক–সেদিক অর্থাৎ পাচার করতে সুযোগ পাইনি। কারণ সেই রবিমামার দোকানে আমার মেজাজি আব্বাজান বসা ছিলেন। কাজেই আমার পকেট খরচার জন্য আনা অবিক্রিত চালগুলো পুনরায় আম্মার হেফাজতে পৌছে গেল। এতো বছর পরেও আজ এগুলো মনে হলে আনমনে হাসি পায়।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে ইনডিয়া যাবার সময় আম্মার কিছু স্বর্ণালংকার (আম্মার অগোচরে) নিয়ে গিয়েছিলাম। ট্রেনিং শেষে এক বৃষ্টি ভেজা ভোরে যখন বাড়িতে এসে পৌছি তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে আম্মার কি কান্না! অপরাধীর মতো ক্ষমা চাওয়ার দৃষ্টিতে আম্মার স্বর্ণের কথা বলতেই তিনি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললেন, *স্বর্ণ নিয়েছো কি হয়েছে। তুমি চাইলে আমি আরো বেশি করে দিতাম। তুমি যে বীর যোদ্ধা হিসেবে দেশে ফিরে এসেছো এটাই আমার বড় পাওনা।*

যুদ্ধের সময় আমাদের গোপনীয় ক্যাম্প (আবুর হাট এলাকা) থেকে রাতের আধারে চুপিসারে বাড়ি আসতাম আম্মাকে এক নজর দেখার জন্য। দেখতাম, আমার আম্মা লম্বা এক তসবিহ হাতে জায়নামাজে বসে আছেন। আমাকে দেখামাত্রই বুকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেলতেন এবং বলতেন, *তোমার জন্য দোয়া করছি, খোদা যেন তোমাকে সহি সালামতে রাখে।*

যুদ্ধ শেষে যেদিন বাড়ি আসি–দেখি পোড়া টিন দিয়ে বানানো ঝুপড়ি ঘর থেকে আম্মা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের সেই উষ্ণ পরশ এবং পরম ভালোবাসার কথা যুদ্ধের তেত্রিশ বছর পরেও ভুলতে পারি না। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধ শেষ হবার মাত্র কয়েকদিন আগেই দেশীয় জানোয়ার (রাজাকার) এবং পশ্চিমা হায়েনার দল মিলে আমাদের ঘরটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

আমার পছন্দের খাবারগুলোর প্রতি আম্মা ছিলেন সব সময় সজাগ। প্রবাস থেকে ছুটি কাটাতে যখন বাড়ি আসতাম, আমার পছন্দের সব কয়টা আইটেম বানাতেন আম্মা। গ্রীষ্মকালে গেলেও শীতের পিঠা তথা ভাপা পিঠা বানিয়ে আমার সামনে হাজির করতেন। খেজুরের রসের বদলে ঝোলা গুড় দিয়ে রস বানিয়ে দিতেন। বিন্নিভাত এবং কোরমা বা লাউয়ের মোরব্বা বানিয়ে সঙ্গে সুগন্ধি পোলাও বানাতেন। আমার যা যা পছন্দ, আম্মা নিজের থেকে সব তৈরি করতেন। মুরগির মাংস রান্না হলে মুরগির মাথাটা আমাকে ছাড়া কাউকে দেবেন না। কারণ আম্মা জানেন, শৈশবকাল থেকে মুরগির মাথা আমার খুব পছন্দ।

এখন আম্মা নেই। তাই মুরগির মাথাও আমার পাতে জোটে না। মুরগি রান্না হলে আগেভাগেই সালমার মা (আমার স্ত্রী) মুরগির মাথাটা গলাধঃকরণ করে। এক সঙ্গে খেতে বসলে আমি আড়চোখে দেখি পাতিলের

ভেতর থেকে কৌশলে মুরগির মাথাটা তার প্লেটে তুলে রাখে। আর তখুনি বুকের ভেতর আমার প্রাণপ্রিয় আম্মাকে স্মরণ করি। কারণ আম্মা থাকলে ওই মুরগির মাথা আমার প্লেটে ছাড়া কোথাও যেতো না। জানি আমার এই লেখায় আমার স্ত্রীরও দৃষ্টি আবদ্ধ হবে। তবে তাতে পরোয়া করি না। আমার আম্মার ভালোবাসা তথা চিরন্তন সত্যটা অকপটে স্বীকার করতে দ্বিধা করবো না।

বার্ধক্যজনিত রোগে বেশ কিছু দিন কষ্ট ভোগের পর আমার আম্মা ১৯৯৫ সালের ৬ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। আম্মার মৃত্যু সংবাদ প্রবাসে বসে পাই। উল্লেখ্য যে, ওই দিন ডিউটিতে ছিলাম। দুপুরে খানার টেবিলে বসলে হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। আধা খাবার শেষ করে রুমে চলে আসি।

বিকেলেই এক সহকর্মী এসে বললো, *আপনার ভগ্নিপতি ফোন করে বলেছেন, আপনাকে তার সঙ্গে জরুরিভাবে দেখা করতে।*

যথাসময়ে ওর ডিউটিস্থলে গেলে আম্মার মৃত্যু সংবাদ শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। হঠাৎ আমার পায়ের নিচে যেন মাটি সরে গেল। আম্মাকে শেষবারের মতো দেখতে পারলাম না। পরক্ষণেই আম্মার জন্য অনেক কেদেছি।

পরের দিন আব্বার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। তার কান্নার জন্য কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল।

পরে আমার বোন এবং বড় মেয়ের সঙ্গে কথা বলি। সবাই সান্ত্বনা দিতে লাগলো। ধৈর্য হারাতে নিষেধ করলো। নামাজ পড়ে আম্মার জন্য দোয়া করতে বললো।

টেলিফোনের এপ্রান্ত থেকে আমার কথা পরিষ্কারভাবে ওরা বুঝতে পারছিল না। কারণ কান্নায় চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে। টেলিফোন রেখে পরক্ষণেই বাড়ি থেকে আনা আম্মার ফটো এবং কথা দিয়ে তুলে আনা ক্যাসেট নিয়ে বসলাম। ফটো দেখে এবং কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার আম্মা এখনো জীবিত আছেন।

দুদিন কাজে যাইনি। শুধু একাকী বসে বসে কেদেছি। আম্মার মৃত্যুর পর নয় বছর পার হয়ে গেল। এখনো প্রবাস জীবনে মাঝে মধ্যে আম্মাকে স্বপ্নে দেখি। সব সময় নামাজের পর দোয়া করি, আমার আম্মা যেন বেহেশতের ফুল বাগানের মাঝে বিচরণ করেন।

ইউএই থেকে

অপেক্ষা

– শরিফ আহমেদ

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে ঢাকার সবচেয়ে বিরক্তিকর মগবাজারের জ্যামে আটকা পড়ে আছে শাহিন, সঙ্গে ওর স্ত্রী লুবনা এবং তার বাবা, মা। জ্যাম ছুটতে আর কতোক্ষণ লাগবে তা ওপরওয়ালাই ভালো জানে।

শাহিন বিয়ে করেছে মাত্র দুই মাস। দুর্ভাগ্যবশত আজ ওর ফ্লাইট। একে তো আর দুই ঘন্টা পর এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং, তার ওপর স্ত্রী লুবনার মন খুব খারাপ। মুখের দিকে তাকাতে পারছে না শাহিন। ওর দিকে তাকালেই বুকের ভেতর কি যেন একটু হু হু করে মোচড় দিয়ে ওঠে।

শাহীন প্রাণপণ চাইছে ফ্লাইটের আগে যেন লুবনা কেদে না ফেলে। কাদলে ও সহ্য করতে পারবে না। যদিও দুই তিন দিন থেকেই লুবনার মুখে কালো মেঘের ঘনঘটা। ঠিকভাবে কথাও বলছে না, শুধু বড় বড় চোখে অপলক তাকিয়ে থাকে, হয়তো মনেপ্রাণে স্বাভাবিক থাকতে চাইছে।

শাহিনের একটা হাত লুবনার হাতের মুঠোয়। দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে পরম মমতায়, গভীর ভালোবাসায় যেন কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেবে না। কিন্তু সবই অব্যক্ত।

নিজের প্রতি ঘৃণা হয় শাহিনের। ছি, এটাকে কি পুরুষের জীবন বলে? দেশে কি আর কোনো পুরুষ বৌ–সংসার নিয়ে করে খাচ্ছে না? তবে এ কেমন জীবন শাহিনের? খুব খারাপ লাগে লুবনার জন্য, তার নিখাদ ভালোবাসার জন্য।

মানুষের মন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় রহস্যের মধ্যে একটা রহস্য। বিয়ের এক মাস আগেও যারা কেউ কাউকে চিনতো না, জানতো না বিয়ের পর এ দুই মাসে তারা কতো আপন, কতো চেনা। এ দুই মাসে শাহিন কিংবা লুবনা কেউ কাউকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি।

গাড়িটা একটু নড়ে ওঠে। দুই তিন হাত সামনে গিয়ে আবার দাড়ায়।

লুবনা এবার শাহিনের কাধে মাথা রাখে।

শাহিন ছোট্ট করে চুমু খায় ওর কপালে। ইচ্ছে করে জীবনের সমস্ত আদর, অফুরন্ত ভালোবাসা এক্ষুণি দিয়ে দিতে। কিন্তু একেবারেই সময় নেই হাতে। বুকটা কেমন যেন ফাকা ফাকা লাগে। বাবা, মা দুজনেই সামনের সিটে।

বাবা ঢাকার ট্রাফিক সিসটেমের মুণ্ডুপাত করছেন আর কপাল কুচকে বার বার ঘড়ি দেখছেন।

শাহিনের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে, ও নিশ্চিত, জ্যাম এক্ষুণি ছুটে যাবে। তারপর ওকে ছেড়ে যেতে হবে একে একে সবাইকে। তাই যতোক্ষণ জ্যাম ততোক্ষণই লুবনার পাশাপাশি থাকা, ততোক্ষণই ভালোবাসার সংস্পর্শে থাকা, ততোক্ষণই নিজের মধ্যে থাকা।

জ্যামের কারণে এয়ারপোর্টে যেতে বেশ দেরি হয়ে গেল। শাহিন বোর্ডিং পাস আনতে গিয়ে দেখলো বিশাল লম্বা লাইন, অথচ ফ্লাইটের সময় আছে মাত্র আধা ঘন্টা। বুঝতে পারলো না কি করবে? বাইরে সবাই শাহিনের অপেক্ষায়। শাহিনই বলে এসেছিল দাড়ানোর জন্য। আবার যদি একটু বাইরে আসতে পারে আবার যদি লুবনার নিষ্পাপ মুখটা দেখতে পারে এই ভাবনায় যখন ঘুরপাক খাচ্ছিল তখনি পেছন থেকে একজন বললো, *একশ টাকা দেন, আপনের কাম কইরা দিতাছি।*

লোকটি সম্ভবত এয়ারপোর্টের ক্লিনার। তাছাড়া সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ, কাকে দিয়ে কি হয়ে যায় বলা তো যায় না? শাহিন দিয়ে দিল লোকটিকে একশ টাকা। বিনিময়ে যদি ওদের আরেক পলক দেখতে পারে সেই আশায়।

শাহিন লোকটির গতিবিধি দেখছে। কারণ লোকটির কাছে তার পাসপোর্ট টিকেট সব। লোকটি কাউন্টারে বসা অফিসার একজনের সঙ্গে ফিস ফিস করলো তারপর কাজ সেরে শাহিনকে পাসপোর্ট টিকেট ফেরত দিল। তখন শাহিনের অবাক হওয়ার সময়ও হাতে ছিল না। সে তাড়াতাড়ি আবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

লুবনার দিকে তাকাতেই শাহিনের কেমন যেন পিপাসার মতো লাগলো। গলাটা মনে হয় শুকিয়ে মরুভূমি, বুকের ভেতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সেই চাপা কষ্ট। লুবনার দিকে তাকিয়ে শাহিন বললো, আমি যাচ্ছি, যেভাবেই থাকো। ভালো থেকো। একদম মন খারাপ করবে না। তুমি আমার লক্ষ্মী বৌ।

লুবনা এতোক্ষণে শাহিনের দিকে তাকালো। অনেক দিনের চেষ্টায় সংবরণ করা কান্নাটাকে লুবনা আর সামলাতে না পেরে শাহিনের বুকে আচড়ে পড়লো। পাগলের মতো বলতে লাগলো, তুমি একবারও ভাবলে না তোমাকে ছাড়া আমি একা কিভাবে থাকবো? কি নিয়ে থাকবো?

শাহিন ভ্যাবাচ্যাকা খেলো। একদম অপ্রস্তুত ছিল ব্যাপারটার জন্য। তবুও কোনোভাবে লুবনাকে বোঝাতে চাইলো কিছু, কিন্তু পারলো না, গলা শুকিয়ে কাঠ। ঠোট কাপছে, বুক ভেঙে যাচ্ছে, তবুও কোনোভাবে বললো, তোমাকে ছেড়ে এই আমার প্রথম এবং শেষ যাওয়া। তারপর আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখন এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে আড়াল হতে দেবো না।

শাহিনের বুকে মাথা রেখে লুবনা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে। চারদিকে হাজার হাজার মানুষ সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে যেন কোনো সিনেমার শুটিং।

শাহিন ইশারায় মাকে ডাকলো।

মা এলেন। লুবনার মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে লাগলেন অনেক কিছু। শাহিনের কানে এসব কিছুই গেল না। সে দেখতে লাগলো লুবনা তার বুক থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে আসছে শাহিনের দৃষ্টি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা যা কাউকে কোনোদিন বোঝানো যাবে না। সময় শেষ হয়ে এলো।

এবার শাহিনকে যেতে হবে একা। সব ছেড়ে। সবাইকে ছেড়ে হতে হবে প্রবাসী। এরপর থেকে শুরু হবে অপেক্ষা, কেবলই অপেক্ষা। ভালোবাসার কষ্টেরা সব অশ্রু হয়ে চোখের কোণে জমাট বাধার আগেই লুকিয়ে ফেলে। তাই কেউ দেখতে পায় না। রুমালের এক কোণে লুকোনো অশ্রুটুকু মুছে দ্রুত পা বাড়ায় শাহিন নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণে, সঙ্গীহীন, ভালোবাসাহীন, একা।

সউদি আরব থেকে
sharifwpi@yahoo.com

কৌমার্য

– জাহেদ ইকবাল

ছোটবেলা থেকেই আমি লাজুক হিসেবে পরিচিত ছিলাম। সহজে কারো সঙ্গে মিশতে পরতাম না। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা তো আমার কাছে রীতিমতো ভীতিকর একটা ব্যাপার। বন্ধুরা যখন মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতো তখন পাশে দাড়িয়ে গাছপালা, আকাশ ইত্যাদি দেখতাম। আমি বোবা কি না প্রশ্ন করা হলে আমার বিখ্যাত লাজুক হাসি উপহার দিতাম।

এভাবে স্কুল, কলেজ পার হয়ে এলাম। খুব ইচ্ছা করতো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু বাস্তবে বলতে পারতাম না।

এইচএসসি পাশ করে ভর্তি হলাম চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে। চট্টগ্রাম শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে গ্রাম্য পরিবেশে ইউনিভার্সিটির অবস্থান।

একদিন কেন যেন শরীর খুব উত্তেজিত হলো। একটা রক্ত মাংসের নারীর সান্নিধ্যের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ভাবছি কি করা যায়! ঢাকার টানবাজার কিংবা গোয়ালন্দ ঘাটের পতিতাপল্লির কথা শুনেছি। চট্টগ্রাম এ রকম কিছু আছে বলে শুনিনি। তবে আবাসিক হোটেলগুলোতে অবৈধ ব্যবসা হয় বলে শুনেছি।

দুপুরের শাটল ট্রেনে চলে এলাম শহরে। একটা হোটেলে বোর্ডার হিসেবে নাম লিখালাম। রুমে বসে ভাবছি কেমন করে আমার চাহিদার কথা বলবো?

এমন সময় রুমবয় এসে জিজ্ঞাসা করলো কিছু লাগবে কি না?

এতো দেখছি মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

বললাম, আমার একজন মেয়ে প্রয়োজন।

বয় উত্তর দিল, এই হোটেলে এখন সম্ভব হবে না। তবে আপনি চাইলে আপনাকে নিয়ে অন্য এক জায়গায় যেতে পারি।

বয়টির উত্তরের প্রথম অংশ শুনে আশাহত হলেও পরের অংশ আমার মনে উৎফুল্ল ভাব ফিরিয়ে দিল। আমি জানি না এই ধরনের কথোপকথনের সাহস কোথে কে পেয়েছিলাম। তবে বেশ সপ্রতিভভাবেই বয়কে বললাম, *চলো*।

হোটেলবয়ের সাথে আমি চললাম। কারো কুমারীত্ব হরণ করতে নয়, নিজের কৌমার্য সমর্পণ করতে।

চট্টগ্রাম থেকে
ziripon 2003@yahoo.com

আশাহত

সবেমাত্র ডিগ্রি পাস করে সরকারি প্রাইমারি স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেছি। স্কুলে আমি একমাত্র মহিলা এবং সবার চেয়ে অনেক জুনিয়র হওয়ায় কলিগরা সবাই আমাকে স্নেহ করেন। তাদের মধ্যে 'ম' সাহেব আমাকে নিজের মেয়ের মতো খুব ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আমিও তার আচার ব্যবহারে মুগ্ধ। স্কুলের পাশেই তার বাড়ি। তিনি সব সময় আমাকে তার বাড়ি যেতে বলেন।

অবশেষে একদিন গেলাম। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এক কথায় সবাইকে খুব ভালো লাগলো। তারা প্রথম দেখাতেই আমাকে আপন করে নেয়। এরপর থেকে আমার এই কলিগের স্ত্রী মানে আন্টি বিশেষ কোনো খাবার তৈরি করলে আমাকে তার খাওয়ানো চাই–ই চাই। খবর পাঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে আদর করে খাওয়াতেন। যেহেতু কলিগের স্ত্রী এবং ছাত্রীর মা, তাই কেউ কিছু মনে করতো না। তাছাড়া আমার মনেও অন্য কোনো ভাবনা কাজ করতো না।

এ মহিলা আমাকে মেয়ের মতো দেখেন এবং সবাইকে বলেন আমি তার মেয়ে। ছেলেমেয়েগুলো আপা বলতে অজ্ঞান। পরিবারটির সঙ্গে ক্রমেই আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এরই মাঝে ম সাহেব ওনার বড় ছেলের জন্য আমার অন্য একজন কলিগের মাধ্যমে আমাকে বিয়ের কথা বলেন।

ধরা যাক, তার নাম রফিক। আমি রফিক সাহেবের মাধ্যমে তাকে জানালাম আমার অভিভাবকরা রাজি থাকলে ভেবে দেখবো। এরপর থেকে তার বাড়ি যেতে ভীষণ লজ্জা লাগতো। তাই বিশেষ প্রয়োজন কিংবা নিমন্ত্রণ ছাড়া যাওয়া হতো না।

ম সাহেব একদিন বললেন, কি ব্যাপার, আপনি আমার বাড়িতে আগের মতো আসেন না কেন? আপনার আন্টি আপনার কথা খুব বলে। আমি চাই আগের মতো সহজভাবে আপনি আসা যাওয়া করবেন।

শুধু একটু হাসলাম। কিছু বললাম না। তাতে হয়তো তিনি আশ্বস্ত হলেন। আমার জন্য এটা খুব স্বস্তিকর যে, তার বাড়ি গেলে তিনি বা তার পরিবারের কোনো সদস্যই আমি অস্বস্তি বোধ করি এমন আচরণ কখনো করেনি।

যাকে নিয়ে এতো সব তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে খুবই কম। তার সঙ্গে দেখা হলে সে কখনো আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক বিষয়ে কোনো কথা বলতো না, বরং আমার চাকরি জীবন কেমন কাটছে, রাজনীতি, অর্থনীতি এসব নিয়েই আলোচনা করতো। সে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ববান বলা চলে। তার যে গুনটি আমাকে মুগ্ধ করেছে, অবাক করেছে সেটি হলো সচেতন মনোভাব।

আমি তাদের বাড়ি এলে সে যদি তখন বাড়িতে থাকতো তবে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতো। প্রথম দিকে ব্যাপারটি কিছুই বুঝতে পারিনি। জানার কৌতূহল হলো। থাকতে না পেরে একদিন বলেই ফেললাম, প্লিজ, আপনার সমস্যাটা একটু বলবেন? যদি পারি তো সমাধানের চেষ্টা করবো।

সে আমার কথার মানেটা বুঝতে পারলো। হাসলো। তারপর খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললো, আপনি আমার বাবার কলিগ। তাছাড়া আপনি অবিবাহিতা। আমি চাই না আমার জন্য আপনার কোনো দুর্নাম হোক।

আমার মাথা আপনিতেই শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো এ ছেলেটির প্রতি।

তাদের স্নেহ মমতায় আমার দিন গড়িয়ে চললো। ততোদিনে আমার অভিভাবকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ছেলেটির শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার সমান। একটি বেসরকারি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করছে। ছেলেটিই এ পরিবারে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত।

অপরদিকে আমি চাকরিজীবী। দেখতে মোটামুটি সুন্দর। আমার পরিবারের সবাই উচ্চ শিক্ষিত। ভাইবোনেরা স্ব স্ব অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই আমার অভিভাবকরা এ বিয়েতে রাজি হতে পারেননি।

তারপরও ম সাহেব বিভিন্নজনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। তারা যে কোনো শর্ত মানতে রাজি ছিলেন। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, আপনি খুব গুণী আর লাকি।

আমি জানি আমার চাকরিলব্ধ অর্থের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। তিনি রাত-দিন পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করতেন, আমাকে যেন পুত্রবধূ হিসেবে পান। তার স্ত্রী আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। আমি তাদের বাড়ি গেলে মহিলা হাতে চাদ পাওয়ার মতো খুশি হতেন। সত্যি কথা বলতে কি, শেষের দিকে আমিও অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম।

ব্যক্তি জীবনে আমার এই কলিগ অত্যন্ত সৎ, দায়িত্ব সচেতন, ধার্মিক, সদাপ্রফুল্ল একজন মানুষ। দলমত নির্বিশেষে তিনি তার এলাকায় একজন জনপ্রিয় মানুষ। এমন একজন ভালো মানুষকে অনিচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ দিতে কষ্টে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু পরিবারের সবার না-কে চেষ্টা করেও আমার একার পক্ষে হ্যা-তে রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি। হয়তো নিয়তির এটাই ইচ্ছে।

এ সময় বদলি হয়ে অন্যত চলে যাই। এর মাস দুয়েক পর ছেলেটির অন্য এক জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়। চিন্তা করলাম যদি বৌ দেখতে না যাই তবে অনেক সমালোচনা হবে।

এক ছুটির দিনে আপুকে নিয়ে বৌ দেখতে গেলাম। ওনারা ছেলের বৌকে খুব আদর করেন দেখে মনটা ভালো লাগায় ভরে গেল আবার ঈর্ষাও হলো।

চলে আসার সময় আন্টি আমার হাত দুটো ধরে বললেন, তুমি সারা জীবন আমার মেয়ে হয়ে থেকো। এ সম্পর্কটা রেখো।

মানুষ মানুষকে এতো ভালোবাসতে পারে তা আমার এই ছোট্ট জীবনে এমন আকুল করা ভালোবাসা কারো কাছ থেকে কখনো পাইনি। আমার ঘুরে-ফিরে কেবলই মনে হয় -

পৃথিবীতে ভালোবাসা সবচেয়ে দামি
বুঝিনি তো আমি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নিরুপায়

– জনি

গতকাল আকাশে ভীষণ রোদ ছিল। আজ সকালে মেঘ। আগামীকাল মনে হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে। হঠাৎ অচেনা একটি মেয়ের চোখে চোখ। কি যেন বলতে চায়। কিন্তু হয়ে ওঠে না। আবার অন্য দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটে গেল। ভাবলাম খেলাটা জমবে ভালো।

মেয়েটার আগ্রহ আমার দিকেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু নাছোড়বান্দা। মেয়ের মাকে পটাতে শুরু করলো। টুকটাক কাজ করে মেয়ের মন পাওয়া তো দূরের কথা, মায়ের মন পাওয়া আরো দুষ্কর।

চোখ যে মনের কথা বলে ভেবে মুখ বন্ধ করে রাখলাম। ওই দিন আর কথা হয়নি।

এ রকম ভালো লাগা নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

পরের দিন কিছু কথাবার্তার পর ও কন্টাক্ট নাম্বার চাইলো।

তাকে একটি চিরকুট দিলাম। Be Happy 0172...। ব্যস, কাজ হয়ে গেলো।

পরদিন থেকে নিয়মিত সময় মোবাইলে কথা চলতে থাকলো। তার কিছু দিন পর হাত ধরাধরি করে লেকের পাড়ে ঘুরে বেড়ানো, পার্কে ছোটাছুটি, ছোট্ট ফুলওয়ালীর মুখে ভাবী ডাক শুনে টাকার নোট হাতে গুজে দেয়া, ট্যাকসিতে চড়তে চড়তে গল্প করা সবই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

তাকে নিয়ে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাওয়া ছিল আরো মধুময়। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম কাটিয়েছি তার সঙ্গে। কিন্তু বর্ষাকে আসতে দেয়নি সে। শীতের ঠাণ্ডা ফুরফুরে আমেজ, মধুবসন্ত, গ্রীষ্মের রৌদ্র উত্তাপ সব কিছুই ছিল আনন্দময় মিষ্টিমধুর।

তাকে অনেক অনুরোধ করেছি আমার সঙ্গে বর্ষা উদযাপন করতে। কিন্তু বর্ষাকে সে খুব ভয় পায়। হয়তো জীবনের কোথাও স্লিপ কেটেছিল এই বর্ষাকে উদযাপন করতে গিয়ে।

আমি মেরিনার। তাই সাগরে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়। *এ সময়, এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না* শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যায় সে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ থেকে

সত্য মেশিন

– আলভী–ইবনে–শিহাব

এক

জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির মহাপরিচালক এম.এ বাতেনের বিশাল টেবিলটার সামনে মুখ কাচুমাচু করে বসে আছে সেকেন্দার আলী। এ লোকটির স্বাক্ষরিত চিঠি পেয়েই সে এসেছে। নিজেকে খুব বেমানান লাগছে। এতো পরিপাটি কোনো রুমে সে কখনো প্রবেশ করেনি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে, মি. বাতেন রিভলভিং চেয়ারে পেছন ফিরে বসে কোনো একটা কাগজ খুব মনোযোগ সহকারে পড়ছেন।

পেছন থেকে কোনো মানুষ সম্পর্কে অনুমান করা যায় না। লোকটা রাগী না মিষ্টভাষী, তার সঙ্গে কি রকম আচরণ করবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তিন মিনিট ধরে একই রকম ভঙ্গিতে বসে আছেন। খুবই উসখুস লাগছে।

ঠিক তিন মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড পর বাতেন চেয়ারটা ঘুরিয়ে সেকেন্দার আলীর মুখোমুখি হলেন। ঝাড়া দশ সেকেন্ড কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকলেন। এই হতদরিদ্র ছেলেটি এমন একটা আবিষ্কার করতে পারে তা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। ছেলেটির শরীরে দারিদ্রতার ছাপ সুস্পষ্ট। মাথার লম্বা চুলগুলো জবজবে তেল দিয়ে পরিপাটি করে আচড়ানো। পরনের শার্টটি কোনো এককালে হয়তো শাদা রঙ ছিল, এখন আর তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। শরীরের নিম্নাঙ্গের পরিধেয় বস্ত্র দেখা না গেলেও তা কি ধরনের হবে সেটা অনুমান করতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ধরনের একটা ছোটখাটো শব্দ বেরিয়ে গেল।

কি দিয়ে কথা শুরু করবেন তা যেন তিনি মনে করতে পারছেন না। তথ্য সংস্থার মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তথ্য সংস্থার লোকগুলো সম্ভবত আজকাল পরিশ্রম না করেই এয়ারকন্ডিশনড রুমে বসে রিপোর্ট তৈরি করে অথবা তথ্য চেপে যায়। সেকেন্দার আলী সম্পর্কে যে রিপোর্টটি তথ্য সংস্থা থেকে পাঠানো হয়েছে, যা তিনি এই মাত্র পড়ে শেষ করলেন সেখানে উল্লেখ আছে, ছেলেটির জন্ম একটি সাধারণ ঘরে। কিন্তু সে যে হতদরিদ্র তা কোথাও উল্লেখ নেই। নিশ্চয় আরো কোনো তথ্য চেপে যাওয়া হয়েছে। রিপোর্টের ওপর নির্ভর করা যাবে না। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

নীরবতা ভাঙলেন বাতেন। আপনি সেকেন্দার আলী?

জি স্যার।

কি কাজ করেন?

তেমন কোনো কাজ করি না।

সংসার চলে কিভাবে?

আমার কাছে প্রতিদিন কিছু মানুষ আসে। তারা খুশি হয়ে যা দেয় তাতেই আমার চলে যায়।
লেখাপড়া কতোদূর করেছেন?
ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, সায়েন্স ছিল।
আর করেননি কেন?
বাবা মারা গিয়েছিলেন, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম।
বিয়ে করেছেন?
জি না স্যার।
বাড়িতে আর কে আছে?
আর কেউ নেই স্যার।
যতোদূর জানি আপনার একটা জমজ বোন ছিল, সে আত্মহত্যা করেছিল, কেন?
ওটা আত্মহত্যা ছিল না, তাকে খুন করা হয়েছিল। আমি এখনো তা প্রমাণ করতে পারবো।
আদালতে এসব কথা বলেননি কেন?
বলেছিলাম, কিন্তু তারা আমার কথা নেয়নি।
দুঃখিত, আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছি। আপনি কি আপনার মেশিনটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?
এনেছি স্যার।
ওটা দিয়ে মূলত কি করা যাবে?
ওটা মাথায় লাগিয়ে কথা বলতে হয় এবং তখন কেউ ইচ্ছে করলেও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আমি নাম দিয়েছি *সত্য মেশিন*।
আপনি এটা কখন, কিভাবে আবিষ্কার করলেন?
স্যার, এর উত্তরটা একটু দীর্ঘ। আপনার হাতে সময় থাকলে বলতে পারি।
এখন থেকে এক ঘন্টা পর আপনার এই মেশিনের ওপর আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। সমাজ কল্যাণমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে আমাকে ডেকেছেন। আপনি খুব সংক্ষেপে বলুন।

দুই

পদ্মপুকুর গ্রামের অত্যন্ত প্রভাবশালী, ধনী এবং দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে মি. মজিদ সুপরিচিত। সুখী মানুষ। বাড়িতে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার ছেলে টাকার অভাবে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারছে না, কে কার বিরুদ্ধে মামলা করলো গ্রামের ইত্যাকার সব সমস্যা তার জানা অথবা বলা যায় লোকজন এসে তাকে জানিয়ে যায় সাহায্যের আশায়।
বিপত্নীক এ ব্যক্তির একটি মাত্র ছেলে সেলিম। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। পাচ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছে। তারপর অতিরিক্ত আদরে বড় হয়েছে। ফল হয়েছে উল্টো। বড় হয়েছে। কিন্তু মানুষ হতে পারেনি। হেন কোনো অপরাধ নেই যা সে করে না। মজিদের ছেলে বলে কেউ নালিশ করে না। কিন্তু একটি ঘটনা পুরো গ্রামকে নাড়া দিয়ে গেল, নাড়া দিয়ে গেল মজিদকে। সর্বস্বান্ত হলো একটি পরিবার।
মজিদ প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে যে লোকটিকে তার সঙ্গে রাখেন তিনি তার পড়শি আরজত আলী। আরজত আলীর এক ছেলে, এক মেয়ে যমজ। যমজ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে তার স্ত্রী মারা গিয়েছে। সমান্য কিছু জমিজমা রয়েছে। যথেষ্ট আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও অনেকটা সুখেই আরজত আলী দিনাতিপাত করছিল। তার ছেলে সেকেন্দার আলী আধা পাগল ধরনের। সারাক্ষণ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি নিয়ে পড়ে থাকে। কারো সাতেও নেই, পাচেও নেই। কিন্তু উল্টো স্বভাবের হয়েছে তার মেয়ে রাজিয়া। এতো রূপবান,

গুণবান এবং প্রাণোচ্ছল একটি মেয়ে এতো সাধারণ ঘরে জন্ম না হয়ে কোনো রাজার ঘরে জন্ম নিলেই হয়তো ভালো হতো।

কথায় আছে, তেলে–জলে কখনো মিশ খায় না। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম হলো। রাজিয়া প্রেমে পড়ে গেল ধনীর দুলাল সেলিমের। দুজনেই দুজনের জন্য পাগল। সারা জীবনে যে কোনোদিন অবাক হয়নি সেই সেকেন্দার আলীও রাজিয়ার মুখ থেকে কথাটা শুনে নির্বাক হয়ে গেল। হাত ধরে পাশে বসিয়ে বোনকে অনেক বোঝালো। ওরা বড়লোক, তোর সঙ্গে তামাশা করছে। তুই ওই ছেলের চালাকি ধরতে পারবি না। তোকে প্রমাণ করে দেবো তুই মিথ্যে, মরীচিকার পিছনে ছুটছিস .... । আরো অনেক কিছু।

কিন্তু রাজিয়া অটল, সেলিমকে তার চাই–ই চাই।

ছয় মাস হাড় ভাঙা খাটুনির পর সেকেন্দার আলী একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলো। প্রথম দর্শনে যে কেউ বলবে ওটা মোটরবাইক চালকের হেলমেট। রাজিয়াকে ডেকে এনে বললো, নিয়ে আয় তোর সেলিমকে, তাকে পরীক্ষা করবো।

রাজিয়া হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের পরীক্ষা?

সেলিম তোকে কতোটা ভালোবাসে, এখুনি তার প্রমাণ হবে। এটা মাথায় পরে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। মুখ দিয়ে উচ্চারণই হবে না।

এ নিয়ে দুই ভাইবোনে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক–বিতর্ক করলো।

শেষমেষ রাজিয়া নিজে গিয়ে সেলিমকে ডেনে আনলো।

সেকেন্দার আলী নিজ হাতে সেলিমের মাথায় হেলমেটটা পরালো। হেলমেটের ভেতর থেকে সাত আটটা ইনসুলেটেড ফ্লেক্সিবল তার বের করে সেলিমের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে দেয়া হলো।

রাজিয়া গালে হাত দিয়ে একপাশে কাত হয়ে বেশ আগ্রহ সহকারে বসে আছে।

সেকেন্দার আলী বললো, আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো, আপনি শুধু উত্তর দেবেন।

আপনার নাম কি?

সেলিম চৌধুরী।

আপনার পেশা কি?

আপাতত ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই।

রাজিয়া কে?

আরজত আলীর একমাত্র কন্যা।

আপনি তাকে ভালোবাসেন?

নিশ্চুপ তবে তার মাথাসহ সারা শরীর কাপছে।

আপনি কি রাজিয়াকে ভালোবাসেন?

নিশ্চুপ তবে কাপুনির পরিমাণ আরো বেড়ে গেল।

আপনি কি রাজিয়াকে ভালোবাসেন?

না, আমি তাকে ভালোবাসি না। পুরোটাই অভিনয়।

এটুকু বলার পর রাজিয়া এক টানে সেলিমের মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেললো। ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, তোর ওই যন্ত্র আমি বিশ্বাস করি না। সেলিমকে হ্যাচকা টান মেরে উঠিয়ে নিয়ে রাজিয়া চলে গেল।

সেদিন রাতে রাজিয়া বাড়ি ফিরলো না। সারা রাত খোজাখুজি করার পর ভোর রাতের দিকে রাজিয়ার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেল মজিদের শান বাধানো পুকুরঘাটে। ভূতের কাণ্ড বলে গুজব ছড়ালো গ্রামে। পুলিশে খবর দিলেন মজিদ।

এরপর ঘটলো অনেকগুলো ঘটনা। পোস্টমর্টেমে জানা গেল, রাজিয়া তিন মাসের অন্তঃস্বত্বা ছিল।

মামলা মোকদ্দমা হলো। আরজত আলী মারা গেলেন। সর্বস্বান্ত হলো সেকেন্দার আলী।

তিন

বিজ্ঞান একাডেমির মহাপরিচালক বাতেন সংক্ষেপে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রীকে সত্য মেশিনটি কিভাবে কাজ করে তা বোঝাচ্ছেন। কিভাবে ভেতর থেকে একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা হয় তার বিশদ বিবরণ দিলেন তিনি। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় আবেশ শরীরের আটটি অংশ দিয়ে মস্তিষ্কের নিউরন সেলে পাঠানো হয়। প্রতিটি মানুষ কথা বলা শুরু করার প্রায় এক পিকো সেকেন্ড আগেই তার মস্তিষ্কে একটি বৈদ্যুতিক আবেশ তৈরি হয়। কথাটি সত্য হলে এক ধরনের আবেশ এবং মিথ্যা হলে আরেক ধরণের আবেশ তৈরি হয়। নাইন ভোল্টের তিনটি ব্যাটারি দিয়ে হেলমেটের ভেতর থেকে কৃত্রিম উপায়ে যে বৈদ্যুতিক চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় তা মস্তিষ্কের মিথ্যা আবেশটাকে শুষে নেয় বা বলা চলে, জিরো করে ফেলে। ফলে এটা মাথায় পরে কেউ আর মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আরো বিশদভাবে বলতে গেলে, কিছু ইলেকট্রিক সার্কিট, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রন এবং প্রোটন সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে হবে।

আর শুনতে হবে না বলে দুমন্ত্রীই তাকে থামিয়ে দিলেন।

দুই সচিবকে ডাকা হলো। তাদের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, এ পর্যন্ত এ মেশিনের আর কোনো কপি হয়নি। আবিষ্কর্তার বাড়িতে প্রতিদিন মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি। দূর-দূরান্ত থেকে ওই দিন প্রেমিক-প্রেমিকারা চলে আসে তাদের প্রেমের পরীক্ষা দিতে। কেউ খুশি মনে আবার কেউ মুখ ভার করে বাড়ি ফেরে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছে বিবাহিত দম্পতিদের নিয়ে। অনেকগুলো ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে। এটেম্প টু মার্ডারের ঘটনা ঘটেছে কয়েকটি। ইদানীং স্থানীয় লোকজন দাবি করছে, এই হেলমেট মাথায় দিয়ে জাতীয় নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক ভাষণ দিতে হবে। আদালতের কাঠগড়ায় সাক্ষীর মাথায় এটা লাগিয়ে জেরা করতে হবে।

সবাইকে বিদায় করে দিয়ে দুই মন্ত্রী ফিশ ফিশ করে কিছু একটা আলোচনা করলেন।

চার

কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে বেশ হেলাফেলায় *প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য দুঃসংবাদ* শিরোনামে সেকেন্দার আলীর মৃত্যু সংবাদ ছাপা হলো। রাজধানী থেকে সরকারি গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ মারা গেছে আধা পাগল বিজ্ঞানী সেকেন্দার আলী। দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি। সেই সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে তার বহুল আলোচিত *সত্য মেশিনটি*।

চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে